মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে দক্ষতা গঠন এবং উন্নয়নে সেবা প্রদানকারীদের অনলাইনের মাধ্যমে আত্ম প্রশিক্ষণের মডিউল

"একজন সেবা প্রদানকারীর বক্তব্য ঃ সমাজের যে কোন দূর্বল হাত যদি একটি বিশ্বস্থ সবল হাতের সংস্পর্শে আসে তাহলে অন্ধকার থেকে সে হাত আলোর দিকে আসতেই পারে।"

নারীপক্ষ

ডিসেম্বর, ২০২১

মূল সম্পাদনায় ঃ

সালমা পারভীন, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী এবং পার্ট টাইম লেকচারার, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রুমা খোন্দকার, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী এবং মনো-সামাজিক পরিচর্যা বিশেষজ্ঞ

সহযোগিতায় ঃ

কামরুন নাহার, প্রকল্প সমন্বয়কারী, নারীপক্ষ

ফরিদা ইয়াছমিন, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, নারীপক্ষ

শুভ সরকার, প্রশিক্ষনরত চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো. নাসিম বিল্লাহ্, প্রশিক্ষনরত চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক ঃ

সাফিয়া আজিম, সদস্য, নারীপক্ষ

কেন এই মডিউলটি?

নারীর প্রতি সহিংসতামূলক ঘটনা-সহ, যে কোন ব্যক্তিগত বা দলীয় আঘাতের (শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক) শিকার ব্যক্তিদের যারা সেবা দিয়ে থাকেন এবং যে ধরনের সেবা দিয়ে থাকেন তার সংগে আক্রান্ত ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সেবার অন্তর্ভূক্তির প্রয়োজন রয়েছে। এর মাধ্যমে সেবা'র মান উন্নয়নের পাশাপাশি আক্রান্ত ব্যক্তির মাঝে জীবনবোধের উন্নয়ন ঘটবে এবং সুস্থ ও ভালো থাকার প্রক্রিয়াটি দীর্ঘমেয়াদী হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

কাদের জন্য এই মডিউল?

সেবাপ্রদানকারী হিসেবে যারাই দায়িত্ব পালন করছেন সকলের দক্ষতা উন্নয়নের জন্যই এই মডিউল। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির মাঝে কিছু প্রস্তুতি এবং আগ্রহ থাকা প্রয়োজন। কেননা এই সেবা প্রদান প্রক্রিয়াটির মান নির্ভর করে সেবাপ্রদানকারী কতটা আগ্রহী, দায়িত্বশীল, সে নিজে ভালো আছেন এবং সর্বোপরি সমাজের মানুষের কল্যাণ বা মঙ্গলের জন্য কতটা আন্তরিক-তার উপর।

একজন সেবা প্রদানকারী হিসেবে, আপনি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারবেন এবং কিছু দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন ঃ

১. স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা বিষয়ে ধারনা লাভ
২. মানসিক স্বাস্থ্য এবং সেবা- বিষয়ে সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা এবং এর ফলে সেবা গ্রহণে সৃষ্ঠ বাধাঁসমূহ সম্পর্কে জানা
৩. কাদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রয়োজন- তাদের চিহ্নিত করার কিছু লক্ষন এবং করণীয়
৪. একজন সেবা প্রদানকারীর কি কি ব্যক্তিগত এবং পেশাগত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন এবং কেন তা জানা
৫. কিভাবে সেবা গ্রহীতার সংগে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং আস্থা স্থাপন করা যেতে পারে এবং কেন, তা শেখা
৬. কি কি উপায়ে সেবা গ্রহীতার সংগে একটি সফল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পার্রে এবং এর প্রয়োজনীয়তা
৭. মনোযোগ সহকারে কিভাবে কথা শোনা যেতে পারে-তার দক্ষতার উন্নয়ন
৮. সেবা গ্রহীতার কথা শোনার পাশাপাশি যথাযথভাবে সাড়া দেওয়ার দক্ষতা উন্নয়ন
৯. সেবা গ্রহীতার সংগে কিভাবে সহমর্মিতা প্রকাশ করা যেতে পারে এবং কেন এই দক্ষতাটি মানসিক সেবা প্রদানকারীদের জন্য অবশ্যই একটি দক্ষতা সে বিষয়ে জানা
১০. সেবা প্রদানকারী হিসেবে নিজের যত্নের গুরুত্ব অনুধাবণ করা
১১. কিভাবে একটি সংকটকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা করা যেতে পারে সে বিষয়ে ধারনা অর্জন
১২. কখন রেফার করতে হবে সে বিষয়ে জানা এবং বোঝা

আপনি কি প্রস্তুত এই আত্ম প্রশিক্ষণটি শুরু করার জন্য?

- প্রশিক্ষণটি সম্পন্ন করতে ১৮ ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হতে পারে
- আপনি চাইলে হাতে যত সময় রয়েছে সেই অনুযায়ী ভাগ করে নিয়ে প্রশিক্ষণটি করতে পারেন
- তবে ধারাবাহিকভাবে এবং একবারে অন্তত একটি অধিবেশণ শেষ করতে পারলে, মনে রাখার সুবিধা হতে পারে
- অনলাইনে হওয়ার কারনে প্রশ্ন করা বা কোন বিষয়ে পরিস্কার না হওয়া বোধ করতে পারেন, মানসিকভাবে তা মেনে নেওয়া
- পাশে কিছু হালকা খাবার এবং পানীয় নিয়ে শুরু করুন মানসিক স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক এই প্রশিক্ষণ ☺

সূচীপত্র ঃ

অধিবেশণের সংখ্যা	অধিবেশণের নাম	পৃষ্ঠা নং
১.	স্বাস্থ্য , মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা	৬-৯
২.	মানসিক স্বাস্থ্য এবং সেবা- বিষয়ে সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা এবং এর ফলে সেবা গ্রহনে সৃষ্ঠ বাধাঁসমূহ	১০-১১
৩.	কাদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রয়োজন- তাদের চিহ্নিত করার কিছু লক্ষণ এবং করণীয়	১২-১৭
৪.	একজন সেবা প্রদানকারীর কি কি ব্যক্তিগত এবং পেশাগত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন এবং কেন	১৮-১৯
৫.	কিভাবে সেবা গ্রহীতার সংগে শ্রদ্ধা , বিশ্বাস এবং আস্থা স্থাপন করা যেতে পারে এবং কেন	২০-২৩
৬.	কি কি উপায়ে সেবা গ্রহীতার সংগে একটি সফল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে এবং এর প্রয়োজনীয়তা	২৪-২৭
৭.	মনোযোগ সহকারে কিভাবে কথা শোনা যেতে পারে	২৮-৩১
৮.	সেবা গ্রহীতার কথা শোনার পাশাপাশি যথাযথভাবে সাড়া দেওয়া	৩২-৩৬
৯.	সেবা গ্রহীতার সংগে কিভাবে সহমর্মিতা প্রকাশ করা যেতে পারে এবং কেন এই দক্ষতাটি মানসিক সেবা প্রদানকারীদের জন্য অবশ্যই একটি দক্ষতা	৩৭-৪১
১০.	সেবা প্রদানকারী হিসেবে নিজের যত্নের গুরুত্ব	৪২-৫১
১১.	কিভাবে একটি সংকটকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা করা যেতে পারে	৫২-৫৪
১২.	কখন রেফার করতে হবে	৫৫-৫৭

অধিবেশণ-১ ঃ স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা

অধিবেশণের উদ্দেশ্য ঃ

এই সেশন শেষে আপনি-

১. মানসিক স্বাস্থ্যের সংগে সম্পর্কিত কিছু বিষয়ের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
২. জানতে পারবেন, কি কি অবস্থা দেখে বোঝা যেতে পারে আপনি মানসিক ভাবে ভালো আছেন
৩. শরীর ও মন যে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত তা বুঝতে পারবেন
৪. মানসিক সমস্যা এবং মানসিক রোগের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারবেন

মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টা আসলে বেশ ব্যাপক এবং অল্প কথায় এটাকে সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন। শুধুমাত্র মানসিক রোগের অনুপস্থিতি মানসিক স্বাস্থ্য নির্দেশ করে না। মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিফলিত হয় ব্যক্তির কাজে, তার চিন্তায়, আবেগীয় অবস্থায় এবং তার সামাজিক কর্মকান্ডে।

স্বাস্থ্য ঃ

মানসিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞায় যাওয়ার পূর্বে দেখা যাক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা কি? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৪৬ সালের সংবিধানে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী "স্বাস্থ্য হলো এমন এক অবস্থা যা শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক এই তিনটির সুস্থ সমন্বয়। এটি শুধুমাত্র অসুস্থতার অনুপস্থিতি নির্দেশ করে না।"

স্বাস্থ্যের এই সংজ্ঞা নির্দেশ করে যে সুস্থতার ক্ষেত্রে শারীরিক স্বাস্থ্যের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য, তাই মানসিক স্বাস্থ্যকে কোন অবস্থাতেই খাটো করে দেখার উপায় নেই।

মানসিক স্বাস্থ্য ঃ

স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা প্রদানের পাশাপাশি, বিশ্ব স্বাস্থ্য (WHO) মানসিক স্বাস্থ্যের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী "মানসিক স্বাস্থ্য" হলো জীবনে ভাল থাকার এমন একটি অবস্থা যেখানে

- **-মানুষ নিজের ক্ষমতাগুলোকে বুঝতে পারে,**
- **-জীবনের সাধারণ চাপমূলক অবস্থার সাথে মোকাবেলা করতে পারে**
- **-উৎপাদনমূলক এবং ফলপ্রসূভাবে কাজ করতে পারে**
- **-এবং তার নিজের কমিউনিটির জন্য অবদান রাখতে পারে।**

অর্থাৎ এটি সামাজিক, শারীরিক, আধ্যাত্বিক এবং আবেগীয় অবস্থার একটি ভারসাম্যপূর্ন অবস্থা। যেখানে সে তার নিজের নিজের বিভিন্ন আবেগীয় অবস্থার (যেমন: রাগ, দু:খ, হিংসা, ভয়, আনন্দ ইত্যাদি) উপর নিয়ন্ত্রন রাখতে

পারে এবং নিজের ক্ষমতা ও প্রবণতাসমূহের সর্বোত্তম প্রয়োগ ঘটাতে পারে এবং কার্যকর পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে"।

স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতে বসে যেমন অসুস্থতা ও তার চিকিৎসার আলোচনায় আটকে পড়লে চলেনা, তেমনি মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও আলোচনা করতে গিয়েও মানসিক অসুস্থতা ও তার চিকিৎসা পদ্ধতি বা চিকিৎসার মধ্যে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করে ফেলাটা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক অসুস্থতাকে হরহামেশাই গুলিয়ে ফেলতে দেখা যায়।

মানসিক স্বাস্থ্যের কতগুলো নির্দেশক রয়েছে, এগুলো হলো ঃ

১) মানসিকভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি কখনও রাগ, ভয়, দু:খ, আনন্দ, হিংসা, অপরাধবোধ, ভালোবাসা ইত্যাদির কাছে পরাজিত হয় না।

২) এরা এদের অক্ষমতাকে সহজে মেনে নিতে পারে।

৩) এরা আত্ম-সম্মানবোধ সম্পন্ন।

৪) এরা বিভিন্ন ধরণের পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে।

৫) নিজেদের ক্ষমতাগুলোকে এরা সঠিকভাবে মূল্যয়ন করতে করে।

৬) অন্যদের সাথে এদের সম্পর্কগুলো সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী এবং কার্যকর হয়।

৭) এরা নিজেদের সমাজের একটা অংশ মনে করে।

৮) এরা বিপদের সময় বসে না থেকে, বিপদকে মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়।

৯) এরা নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহন করতে পারে।

১০) এরা নিজেদের কাজের দায়িত্ব নেয় এবং অন্যদের প্রতি তাদের দায়িত্বকেও অস্বীকার করে না।

১১) জীবনের প্রতি একটি ইতিবাচক মনোভাব থাকে।

মানসিক সমস্যা এবং মানসিক রোগ ঃ

যখন দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা চলতে থাকে, ফলশ্রুতিতে ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হয় এবং বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায়, ব্যক্তি মানসিক ভাবে অসুস্থ, তখন বলা যায় যে ব্যক্তি জটিল মানসিক রোগে ভুগছে। বেশিরভাগ মানুষই জটিল মানসিক রোগে ভোগেনা, কিন্তু অনেকেই কোন এক ধরনের মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে। মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তির নানা ধরনের ভোগান্তি হয় কিন্তু বাহির থেকে তাদের সমস্যাটি প্রকটভাবে বোঝা যায় না। এক্ষেত্রে সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য ব্যক্তির প্রয়োজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাউন্সেলর, সাইকোথেরাপিষ্ট বা চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীদের সেবা।

মানসিক অসুস্থতা বা রোগ ঃ

মানসিক অসুস্থতা বা রোগ বলতে সাধারণত বোঝায় "আচরনের অস্বাভাবিক এবং অসহনীয় এক অবস্থা যা উপযোজনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে"। মানসিক অসুস্থতা বা মানসিক রোগ বলতে জটিল মানসিক রোগ যেমন স্কিজোফ্রেনিয়াকে বোঝায়।

মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক রোগের মধ্যে পার্থক্য

মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক অসুস্থতার মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্যটা হলো এই যে, মানসিক অসুস্থতার অনুপস্থিতি সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্য নির্দেশ করে না। মানসিক স্বাস্থ্যের অর্থ আরও ব্যাপক, মানসিকভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য মানসিক রোগ না থাকা শুধুমাত্র একটি বিষয়, এর বাইরে আরো কিছু বিষয় অর্জন করা দরকার, যা মানসিক স্বাস্থ্যের সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে।

শরীর ও মন-পরস্পরের সাথে সম্পর্ক ঃ

আমরা সবাই জানি, শরীর ও মন পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। শরীর খারাপ থাকলে মন ভালো থাকেনা, আবার মন খারাপ থাকলেও শরীরের উপর তার প্রভাব পড়ে। অনেক সময় দেখা যায়, শারীরিক অসুস্থতার পিছনে মানসিক অনেক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শারীরিক অসুবিধার ফলস্বরূপ বিভিন্ন রকম মানসিক উপসর্গ দেখা যায়। তাই বলা যায়, শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে মানসিক উপাদানগুলো কারণও হতে পারে আবার ফলাফলও হতে পারে। কাজেই মানসিক উপাদান গুলো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমরা শারীরিক অসুস্থতাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

গবেষণায় দেখা গেছে দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে আমাদের জীবন প্রণালী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা এমন কিছু কাজ করি যা আমাদের স্বাস্থ্যেও জন্য হুমকিস্বরূপ। যেমন- ধূমপান, অধিক মাত্রায় মদ্যপান, অধিক মাত্রায় ঔষধগ্রহন, ভুল খাদ্যাভ্যাস এবং শারীরিক অনুশীলনের অভাব, এই ব্যপারগুলো পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যের উন্নতি ও রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। জীবন প্রণালী ছাড়াও ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাধারা, রোগের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি- রোগের সাথে সে কিভাবে মোকাবেলা করছে-ইত্যাদি বিষয়গুলো শারীরিক অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও আছে ব্যক্তির মনোযোগ, মনোভাব,আবেগ, ব্যক্তিত্ব- যা শারীরিক অসুস্থতার অনুধাবনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- যে ব্যক্তি মনে করে "এই অসুখ আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে"-তার চাইতে যাদের বিশ্বাস হলো, "আমি এই অসুখ থেকে মুক্ত হতে পারব না" তারা মানসিক দিক থেকে রোগের সাথে ভালো অভিযোজন করতে পারে। আবার কেউ কেউ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে যা তার রোগকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার কথা বলা যেতে পারে। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শরীরে বা মাথায় তীব্র ব্যথা হলে ঔষধ খেয়ে বিছানায় শুয়ে থাকি। কিন্তু বিছানায় শুয়ে কম লোকই ঘুমাতে পারেন, উপরন্তু ব্যথা নিয়ে বিভিন্ন দুঃশ্চিন্তা করেন- যা ব্যথার মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। যেসব মানসিক উপাদান ব্যথার অনুভুতিকে বাড়িয়ে দেয় তাহলো উত্তেজনা, মানসিক চাপ ও দুঃশ্চিন্তা, মনখারাপ, হতাশা ও বিষণ্নতা এছাড়াও আছে-ব্যথার প্রতি অত্যধিক মনোযোগ, ক্লান্তি, একঘেয়েমী কাজকর্ম করা, আলস্যে অবসর কাটানো। আমরা সবাই কম বেশি জানি যে, উচ্চ রক্তচাপ রক্তে চর্বির আধিক্য, অতিরিক্ত কাজের চাপ, ক্লান্তি, শারীরিক পরিশ্রম না করা ইত্যাদির সাথে হৃদযন্ত্রের সুস্থতা জড়িত। তবে এর পাশাপাশি আর একটি বিশেষ আচরণ পদ্ধতি হৃদরোগের সম্ভাব্যতা বাড়ায়-

যার নাম- "টাইপ- এ বিহেভিয়ার" (Type A Behavior Pattern: TABP) টাইপ- এ বিহেভিয়ার প্রধানত ঃ তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঃ

১. এরা খুব প্রতিযোগী মনোভাবপন্ন এবং সব কাজে সফলতা চায়।
২. এদের সব সময় মনে হয় সময় খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে তাই তারা অল্পসময়ে অনেক বেশী পরিশ্রম করতে চায় যা তার জন্য চাপ পূর্ণ।
৩. এরা খুব সহজেই রেগে যায়, কেউ কেউ প্রকাশ করেন, কেউ করেন না।

এবার জানা যাক, এই আচরণ ধারা কিভাবে হৃদরোগের সাথে যুক্ত?

বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে এ পর্যন্ত যে উত্তরটি পাওয়া গিয়েছে তা হলো এই সম্পর্কের পেছনে প্রধানত যে কারণটি রয়েছে তা হচ্ছে এ ধরনের মানুষের সার্বক্ষণিক অধিক চাপের মধ্যে থাকা। ব্যক্তি যখন চাপমুলক পরিস্থিতির মধ্যে থাকে তখন তার শরীর উদ্দীপ্ত হয় এবং কিছু হরমোন নিঃসৃত হয়। এই হরমোন শরীরের বিভিন্ন অংশকে এই চাপের মোকাবেলা করতে সচল রাখে। আর বিভিন্ন অঙ্গকে সচল রাখতে রক্ত সঞ্চালন বেশি হওয়া প্রয়োজন যা বজায় রাখতে হৃদপিন্ড অধিক হারে স্পন্দিত হয়। এই অবস্থা দীর্ঘক্ষন ধরে চলার ফলে হৃদপিন্ড ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলস্বরূপ যারা টাইপ এ আচরণ করে থাকেন তারা হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারেন যে কোনো মুহূর্তে।

ক্যান্সার রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ক্যান্সার হওয়ার আগে তাদের অনেক চাপমূলক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে সে যদি তার চাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো তাহলে হয়তো ক্যান্সারের মতো জীবন নাশকারী রোগকে নিয়ন্ত্রন করতে পারত। আবার দেখা যায়, ক্যান্সার, ডায়বেটিস এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রথমবার শনাক্ত হওয়ার পর ব্যক্তির পক্ষে এই সত্য গ্রহণ করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা যেমন-হতাশা, উদ্বিগ্নতা, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা, কাজকর্মে উৎসাহ কমে যাওয়া, সবকিছু থেকে নিজেকে বিরত রাখা,ঔষধ গ্রহণে অনীহা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। এইসব মানসিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যক্তিকে এই রোগের সাথে মোকাবেলা করতে সাহায্য করা যায়।

এতক্ষণে আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে শারীরিক সুস্থতার শারীরিক উপাদানগুলোর পাশাপাশি মানসিক উপাদানগুলোকেও আমাদের গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে এবং এসব উপাদান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে হবে।

অধিবেশণ-২ ঃ মানসিক স্বাস্থ্য এবং সেবা- বিষয়ে সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাসমূহ এবং এর ফলে সেবা গ্রহনে সৃষ্ঠ বাধাঁসমূহ

অধিবেশণের উদ্দেশ্য ঃ

এই সেশন শেষে আপনি-

১. **মানসিক স্বাস্থ্য, সমস্যা, রোগ এবং সেবা সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে জানবেন**
২. **এর ফলে ব্যক্তির জীবনে কি ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়ে ধারণা পাবেন**

আমাদের দেশে মানসিক স্বাস্থ্য, মানসিক রোগ ইত্যাদি বিষয়ে একদিকে যেমন রয়েছে সচেতনতার অভাব তেমনি অন্যদিকে রয়েছে অজ্ঞতা এবং অসংখ্য ভ্রান্ত ধারনা। প্রতিটি ব্যক্তিরই জীবনের কোন এক পর্যায়ে মানসিক সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি বুঝতে পারেনা যে তার সমস্যা রয়েছে এবং সাহায্যের দরকার। যদি বুঝতে পারেও, জানেনা তার কি করা উচিত বা কোথায় গেলে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া ব্যক্তি সংকোচবোধ করে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং মনোবিজ্ঞানীর কাছে যেতে, কারন মানসিক সমস্যা বা রোগ সম্পর্কে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারনা এবং কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। একারণে মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক রোগ বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা এবং সচেতনতা তৈরি করা অত্যন্ত জরুরী।

কিছু প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা এবং বাস্তব সত্য জানা ঃ

প্রচলিত ধারণা ঃ মানসিক অসুস্থতা মানে তুমি ‘পাগল’।

বাস্তব ধারণা ঃ মানসিক অসুস্থতা হচ্ছে মানসিক রোগ। ‘পাগল’ ‘মাথা খারাপ’ ইত্যাদি আখ্যায়িত করার ফলে ব্যক্তির মধ্যে এক ধরনের কষ্টের সৃষ্টি হয় এবং সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

প্রচলিত ধারণা ঃ মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি নিজে থেকেই সুস্থ হতে পারে।

বাস্তব ধারণা ঃ মানসিক অসুস্থতা কোন ব্যক্তিগত দুর্বলতা নয়, তাই এর আরোগ্য লাভও ব্যক্তির নিজে থেকে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত চিকিৎসা।

বাস্তবধারণা ঃ কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে, মানসিক অসুস্থতা ডায়াবেটিস রোগের মত আজীবন থাকতে পারে কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে ব্যক্তি সুন্দরভাবে নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে পারে।

প্রচলিত ধারণা ঃ মানসিক অসুস্থ ব্যক্তি প্রায়ই আক্রমণাত্মক হয় ।

বাস্তব ধারণা ঃ মানসিক অসুস্থ ব্যক্তি আক্রমণ করার থেকে আক্রমণের শিকারই বেশী হয়। উপযুক্ত চিকিৎসা পেলে তাদের মধ্যে আক্রমণ করার সম্ভবনা সাধারন মানুষের থেকে বেশী হবে না।

প্রচলিতধারণা ঃ শিশুরা মানসিক অসুস্থতায় ভোগেনা।

বাস্তব ধারণা ঃ লক্ষ লক্ষ শিশুরা অবসাদ, উদ্বেগ এবং অন্যান্য মানসিক অসুস্থতায় ভুগছে। এ ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা একান্ত প্রয়োজন।

প্রচলিত ধারণা ঃ মানসিক অসুস্থতা আমার নিজের উপর প্রভাব ফেলে না।

বাস্তব ধারণা ঃ যে কেউই মানসিকভাবে অসুস্থ হতে পারে। যে কোন বয়স জাতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, আবহাওয়া অথবা পরিবারের কোন ইতিহাস না থাকলেও ব্যক্তি মানসিকভাবে অসুস্থ হতে পারে।

মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে ভ্রান্ত ধারণার কারণে ভোগান্তির শিকার ব্যক্তি সঠিক মানসিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়। মানসিক সমস্যার বিষয়ে অসচেতনতা এবং কুসংস্কারের কারণে ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের অপচিকিৎসার শিকার হয়। ফলে বিভিন্ন ধরনের তাবিজ, পীর-ফকির, জ্বীন তাড়ানো বা অনেক ক্ষেত্রে স্ব-উদ্ভাবিত বা স্বপ্নে পাওয়া ঔষধের মাধ্যমে চলতে থাকে অপচিকিৎসা।

পরিণতিতে ঘটতে থাকে আরো অধিক মাত্রার মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন। পাশাপাশি আর্থিক অপচয় এবং ধোকাবাজির শিকার হয়ে ব্যক্তি আত্ম-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং দিনে দিনে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

অধিবেশণ-৩ ঃ কাদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রয়োজন- তাদের চিহ্নিত করার কিছু লক্ষণ এবং করনীয়

অধিবেশণের উদ্দেশ্য ঃ

এই সেশন শেষে আপনি জানতে পারবেন-

১. মানসিক স্বাস্থ্য সেবা কাদের প্রয়োজন, তা চিহ্নিত করতে পারবেন।
২. মানসিক সমস্যা এবং মানসিক রোগের লক্ষণগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন
৩. জানার পরে আপনার করনীয় পদক্ষেপ কি হতে পারে তা অনুধাবণ করতে পারবেন

মানসিক স্বাস্থ্য সেবা কেন প্রয়োজন

বাংলাদেশের পূর্ণবয়সী মানুষের মধ্যে ১৬.১ ভাগের এবং ঢাকা ডিভিশনের শিশু- কিশোরদের মধ্যে শতকরা ১৮.৩৫ ভাগের মানসিক রোগ আছে। যারা সমাজের বঞ্চিত, ও অনগ্রসর শ্রেণীর, যারা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার বা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে তেমন শিশু- কিশোর ও বড়দের মধ্যে এই হার আরো বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। মানসিক সমস্যা এবং মানসিক রোগ এটা যাদের আছে তাদের সবারই মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রয়োজন।

মানসিক অসুস্থতার ফলে ব্যক্তির উপর অনেক প্রভাব পড়ে। ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, পেশাগত অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কম বেশী নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফলে ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা কমে যায় এবং কাজ করার সক্ষমতা কমে যায়। কিন্তু যথোপযুক্ত চিকিৎসার ফলে একজন মানসিক রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে এবং সুস্থ জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার জন্য আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং মানসিক রোগ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।

মানসিক সমস্যার কারণসমূহ ঃ

বিভিন্ন কারনে ব্যক্তির মধ্যে মানসিক সমস্যা তৈরি হতে পারে যেমন : জৈব রাসায়নিক উপাদানের প্রভাব, জীনের প্রভাব, শারীরিক গঠনগত দুর্বলতার প্রভাব, মস্তিষ্কের ক্ষতিজনিত কারন, আর্থসামাজিক কারণ ইত্যাদি। তবে গবেষকরা যেসব মনোসামাজিক বিভিন্ন উপাদানের উপর জোর দিয়েছেন, সেগুলি নিম্নরুপ :

- শৈশবকালীন বঞ্চনা
- কাছের কারো মৃত্যু বা তীব্র বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া, যেমন- আশ্রয়কেন্দ্রে বড় হওয়া
- অপর্যাপ্ত পিতৃ- মাতৃ স্নেহ
- আসামঞ্জস্য শিশু প্রতিপালন পদ্ধতি (কঠোর শাস্তি, অতিরিক্ত পশ্রয়দান ইত্যাদি)
- বাবা- মায়ের দাম্পত্য কলহ
- ভাইবোনের দ্বন্দ্ব ও কলহ
- শিশুর সঙ্গে বাবা- মার ত্রুটিপূর্ণ সম্পর্ক

- সামঞ্জস্যহীন সমবয়সী দল
- সঠিক নিয়মশৃঙ্খলা বা সঠিক নির্দেশনার অভাব
- ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ, সমাজের অন্যদের সাথে মেশার সুযোগের অভাব এবং কোন দলের সাথে একাত্মতা অনুভবের অভাব।
- ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন
- ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ, সমাজের অন্যান্যদের সাথে মেশার সুযোগের অভাব এবং কোন দলের সাথে একাত্মতা অনুভবের অভাব ইত্যাদি।

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার লক্ষণ ঃ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার লক্ষণ সাধারনত ৪ রকমের হয়ে থাকে যথা :

১. জ্ঞানীয়
২. আবেগীয়
৩. শারীরবৃত্তীয়
৪. এবং আচরণগত

অতিরিক্ত অস্থিরতা, কাজের প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়া, দুশ্চিন্তা, ঘুমের সমস্যা, অতিরিক্ত ভয় পাওয়া, অপরাধবোধ, নিজেকে ছোট মনে করা, হতাশ ভাব, বিষন্নতা, জীবনে ব্যর্থ মনে করা, আত্মহত্যার চিন্তা, মাথাব্যথা, বুকের মধ্যে চাপ অনুভাব করা, ক্ষুধামন্দা, দূর্বলতা, বুক ধরফর করা, নিশ্বাষ নিতে কষ্ট অনুভত হওয়া, হাত- পা কাপা ইত্যাদি মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার সাধারন লক্ষণ।

মানসিক রোগ ও লক্ষণ সমূহ ঃ কারো মানসিক রোগ হয়েছে কিনা তা বুঝতে হলে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ করা দরকার:

- ব্যক্তির মধ্যে কতগুলো মানসিক সমস্যার লক্ষণ থাকবে
- এই লক্ষণগুলো কয়েকমাস বা তার বেশী সময় ধরে উপস্থিত থাকবে
- এই লক্ষণগুলোর মাত্রা যথেষ্ট তীব্র হবে
- মানসিক সমস্যার লক্ষণগুলোর কারনে ব্যক্তির জীবনযাত্রা ভীষণভাবে বিঘ্নিত হবে। যেমন- তার লেখাপড়া, ঘড়ে গৃহপালিত কাজ, পেশাগত কাজ, আন্তব্যক্তিতে সম্পর্ক, পারিবারিক জীবন, যৌন সম্পর্ক ইত্যাদি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে।
- এই লক্ষণগুলো কোন শারীরিক বা নিউরোলজিক্যাল অসুখের কারনে কোন ঔষধের প্রভাবে বা কোন নেশাদ্রব্য বা কোন অ্যালকোহলের কারনে তৈরি হইনি।

উপরের বিষয়গুলো যদি কারো মধ্য থাকে তাহলে বলা যায় তার মানসিক রোগ হবার সম্ভাবনা আছে।

<u>করনীয় পদক্ষেপ সমূহ ঃ</u>

মানসিক রোগের লক্ষণ সম্পর্কে ধারণা থাকাটা বিশেষ ভাবে দরকার।

মানসিক রোগ নির্ণয়ের জন্য মানসিক রোগের ডাক্তার বা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে পাঠিয়ে দিলে তারা নামসহ রোগ নির্ণয় করতে পারবেন।

মানসিক ভাবে অসুস্থ কাউকে পাওয়া গেলে নিজে প্রাথমিক পর্যায়ের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে যথাযথ বিশেষজ্ঞদের কাছে রেফার করবেন। কোথায় রেফার করতে হবে বা পাঠাতে হবে তার একটি তালিকা সেশন-১২ তে পাবেন।

কিছু সাধারন মানসিক অসুস্থতা ঃ

বিষন্নতা ডিসওর্ডার/বৈকল্য

এটি যেকোন মানসিক অসুস্থতার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত অসুস্থতা। যে কোন মানুষই জীবনের যে কোন সময় এই বিষন্নতায় ভুগতে পারে। কিন্তু মানসিক রোগ হিসেবে বিষন্নতাকে তখনই ধরবো যখন তাদের মধ্যে মন খারাপ, দ্যুঃখবোধ বা শূন্যতা বোধ থাকে। তাদের যে ধরনের কাজে পূর্বে আগ্রহ কাজ করত সে ধরনের আগ্রহ না থাকা। যে কোন কাজে শক্তি হারিয়ে ফেলা, মনোযোগ ধরে রাখতে, আলোচনা চালিয়ে যেতে অথবা সহজ কোন সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হয়। এর সাথে তাদের মধ্যে আত্যহতার চিন্তা বা উদ্দেগ দেখা যেতে পারে। এই ধরণের সমস্যা যখন দীর্ঘদিন কারো মধ্যে দেখা যায় তখন তাকে বিষন্নতা বলে। বিষন্নতার লক্ষনগুলো দুর করার জন্যঔষধ এবং সাইকোথেরাপি দুইটি বিষয়টি কার্যকর। কারো কারো ক্ষেত্রে বিষন্নতার লক্ষনগুলো কিছুদিন ফিরে আসতে পারে, সেক্ষেত্রে একজন মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখাটা জরুরী।

উদ্দিগ্নতা ডিসওর্ডার/বৈকল্য

উদ্দিগ্নতার মধ্যে অনেকগুলো অসুস্থতা রয়েছে যাদের প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে অস্বাভাবিক বা অনুপযোগী উদ্দিগ্নতা । প্রতিটি মানুষই উদ্দিগ্নতা বোধ করে। হঠাৎ কোন গন্ডগোলের আওয়াজ পাওয়ার পর ব্যক্তির সাধারনত হৃৎপৃন্ডের স্পন্দন বেড়ে যায়, শ্বাষ-প্রশ্বাষ বেড়ে যায়, মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায় এবং শব্দের উৎসের দিকে মনোযোগ দেয়। এটি মানুষের দেহের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এর অর্থ হচ্ছে শরীর নিজে নিজে যুদ্ধ করার জন্য বা বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে পালানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই লক্ষণগুলোই সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন কোন সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই এগুলো দেখা যায়। অন্যকথায় বলা যায় যে, যখন কোন সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই মানুষের মধ্যে হৃৎপৃন্ডের স্পন্দন বেড়ে যাওয়া, শ্বাষ-প্রশ্বাষ বেড়ে যাওয়া, মাংসপেশী শক্ত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি দেখা যায় তখন তাকে উদ্দিগ্নতা বলে। উদ্দিগ্নতার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের অসুস্থতা রয়েছে, তাদের কিছু বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. জিএডি (জেনারেলাইজড এ্যাংজাইটি ডিসওর্ডার)/সাধারনত উদ্দিগ্নতা বৈকল্য ঃ

সাধারন উদ্দিগ্নতা বৈকল্যতে ব্যক্তি ক্রমাগতভাবে অস্থিরতা অনুভব করা, হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি, মাথা ঘোরানো, অল্পতে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া, কোন কাজে মনোযোগ দিতে অসুবিধা হওয়া এবং অতিরিক্ত দ:শ্চিন্তা ইত্যাদি অনুভব করা। এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট বা সুনির্দিষ্ট নয় অথবা বাস্তবিক জীবনের বিপদ মোকাবেলার চেয়ে বেশি পরিমানে হয়। এই অবস্থা একটানা প্রায় ছয় মাসের মত স্থায়ী হয়। ব্যক্তির জীবনের বিপদমুক্ত হয়ে গেলেও অন্য কোন বিষয় এসে তাকে একই ধরনের অনুভুতি তৈরী করে। এই অবস্থা নিয়ন্ত্রন করা ব্যক্তির জন্য অসম্ভব এবং এটি ব্যক্তির বাড়িতে, কাজে বা সামাজিক কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিজের সম্পর্কে খুব নিম্ন ধারণা পোষণ করে এবং সারাক্ষণ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এই রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঔষধ এবং সাইকোথেরাপীর কার্যকারীতা দেখা গেছে।

২. সামাজিক ভীতি ঃ

সামাজিক ভীতি একটি উদ্দিগ্নতা বৈকল্য যাতে ব্যক্তির লজ্জিত, অপমানিত, তাচ্ছিল্যের পাত্র ইত্যাদি হওয়ার জন্য বেশী পরিমানে অস্বস্তি থাকে। এমনকি যখন তারা এই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তার পূর্বে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে

পড়ে, তাদের মধ্যে অস্বস্থি শুরু হয় বিষয়টি নিয়ে এবং ঐ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে অযথা বিলম্ব করে। এই ধরনের ব্যক্তিরা বেশী অসুবিধায় পড়ে সবার সামনে কথা বলতে গিয়ে, অন্য কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে, কতৃপক্ষস্থানীয় কারো সাথে কথা বলতে গেলে, অনেকের সামনে খেতে গেলে এবং গনশৌচাগার ব্যবহার করতে গেলে। এই রোগটিকে অনেক সময় লাজুকতা বলে ভুল ধারনা করা হয়। লাজুক ব্যক্তিরা অন্যদের সামনে অস্বস্তি বোধ করে কিন্তু তাদের কোন সামাজিক পরিবেশে অত্যন্ত উদ্বিগ্নতা আসবেনা এবং তারা সাধারনত এই ধরনের পরিস্থিতি এড়িয়ে নিজের অস্বস্থি কমানোর চেষ্টা করবে না। অন্যভাবে সামাজিকভাবে ভীত ব্যক্তি সবসময় লাজুক নয় বরং তারা কিছু মানুষের সামনে বেশীরভাগ সময় পুরোপুরি সহজ হতে পারে। সামাজিকভাবে ভীত ব্যক্তিরা সাধারনত দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের বিষয়কে এড়িয়ে চলে এবং এটি এত বেশী মাত্রায় হয়ে পড়ে যে ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন এতে বাধাগ্রস্থ হয়। এটি তাদের জীবনযাপন, জীবিকা, সামাজিক যোগাযোগ সব কিছুতে বাধার সৃষ্টি করে। এই ধরনের অসুস্থতার ক্ষেত্রে সাইকোথেরাপি বা মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ভালো সুফল পাওয়া গেছে।

৩. মুক্তস্থানাতঙ্ক/ ভিড়ের প্রতি ভীতি

এই ধরনের উদ্বিগ্নতা বৈকল্য হলে ব্যক্তি ঐ ধরনের পরিস্থিতিতে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে যেখান থেকে সে সহজে বের হতে পারবে না। এই রোগটি খুব তীব্র কারণ এই রোগীরা প্রায়ই প্যানিক অ্যাটাক বা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং এরা সাধারণভাবেই তাদের ভয়ের স্থান এবং বিষয় এড়িয়ে চলে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা বাসায় একা থাকতে, বাহিরে একা একা যেতে, ভিড়ের মধ্যে যেতে, যানবাহনে ভ্রমণ করতে, লিফ্ট বা ব্রিজে উঠতে ভয় পায়। ভীড়ের প্রতি ভীত ব্যক্তিরা সাধারণত ভিড়ের স্থান যেমন রাস্তা, জনসমাগম, দোকান, চার্চ, মেলা, সিনেমা হলে ইত্যাদি জায়গা এড়িয়ে চলে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পরপর কয়েকবার কোন যোগসূত্র ছাড়াই প্যানিক অ্যাটাক হয় এবং কোন বিষয়টি এটির কারণ তা ধারণা করাটা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং যোগসুত্র ছাড়া প্যানিক অ্যাটাক ভবিষ্যতে এরূপ হবার ভয় তৈরি করে এবং এমন পরিস্থিতির প্রতি ভয় তৈরি করে যেখানে এটি আবার হতে পারে। এই ভিড়ের প্রতি ভীতি এত প্রকট হতে পারে যে ব্যক্তি তার নিজের বাসার বাহিরে কোথাও বের হতে পারে না।

৪. শূচিবায়ূ ঃ

এটি একটি উদ্বিগ্নতা বৈকল্য। এই অসুস্থতার মূল লক্ষণ হচ্ছে ক্রমাগত বদ্ধ ধারণা,প্রায়ই অযৌক্তিক ধারণা, অনিয়ন্ত্রিত ধারণা, ভয়,দুশ্চিন্তা এবং এমন কোন কাজ ক্রমাগত করে যাওয়া যা এই অস্বস্তি থেকে সাময়িক পরিত্রান ঘটায়। এই রোগের একটি খুব পরিচিত উদাহরণ হচ্ছে একজন ব্যক্তির স্থায়ী, ক্রমাগত এবং অনিয়ন্ত্রিত ধারণা হচ্ছে যে সে অপরিচ্ছন্ন, রোগ বাহিত, নাপাক, অশূচি। এবং এই অস্বস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি প্রতিনিয়ত হাত ধুতে থাকে এবং প্রতিবার ঐ চিন্তা থেকে সাময়িক মুক্তি পায়। এই রোগে অসুস্থ ব্যক্তির সমস্যা এত প্রকট হয়ে পড়ে যে এটি তার দৈনন্দিন কাজকর্মে বাধা দেয়, এক কাজ বারবার করতে হয়, কোন কিছু বারবার চেক করতে হয় এবং এটি তার জন্য অত্যান্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়ে পড়ে। শুচিবায়ু সারার জন্য ঔষধ সেবন করতে হয় তবে তাদের আচরণ, চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার কিছু কৌশল, তাদের দুশ্চিন্তার সাথে মোকাবিলা করা এবং এই চিন্তার পিছনে লুকানো বিষয় গুলো খুঁজে বের করতে সাইকোথেরাপি কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

স্কিজোফ্রেনিয়া

সাধারণত পুরুষদের ক্ষেত্রে কৈশোরের শুরু থেকে প্রাক প্রাপ্তবয়স্ক সময়ে এবং নারীদের ক্ষেত্রে আরো কিছুবছর পর কোন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ সময়ের ফলাফল হিসেবে এই অসুস্থতা দেখা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্রান্ত ধারণা এবং

দৃষ্টিবিভ্রম,শ্রুতিবিভ্রম, অগোছালো আচরণ বা কথাবার্তা দেখা যায়। এবং এটি বাড়তে বাড়তে একটা সময় নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাওয়া, অনুভূতির সাথে আচরণের মিল না থাকা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। এই ধরনের রোগীদের জন্য অতিসত্তর ঔষধ শুরু করাটা জরুরী।

পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (পিটিএসডি)

যে সমস্ত সারভাইবার অপহরণ, পাচার, যৌন নির্যাতন অথবা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় তাদের মধ্যে বিভিন্ন ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকে নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

PTSD হচ্ছে তেমনি একটি মানসিক অসুস্থতা যার মূলে ব্যক্তির ভয়াবহ নেতিবাচক অভিজ্ঞতা সমূহ কাজ করে । PTSD আক্রান্ত ব্যক্তির মাঝে Flash back, দুঃস্বপ্ন, দুশ্চিন্তা দেখা দেয় সেই সাথে ব্যক্তির এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পূনঃপুনিক চিন্তার ওপর ব্যক্তির কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এই ধরনের উপসর্গ সময়ের সাথে সাথে কমে আসতে পারে যদি যথাযথ মানসিক সেবা নিশ্চিত করা যায়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েক মাস এমনকি বেশ কিছু বছর ধরে ঐ চিন্তা, দুঃস্বপ্ন ও অতীতের ঘটনা পূনঃ অনুভব করতে থাকে।

PTSD মহিলাদের মধ্যে পুরুষের চাইতে প্রায় দ্বিগুণ আকারে বিদ্যমান। এটি যেকোন বয়সের ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিতে পারে।PTSDআক্রান্ত ব্যক্তির মাঝে হতাশা, ড্রাগ/মাদকের নেশা, অন্যান্য উদ্দ্বেগজনিত রোগ সহজে সংক্রমিত হতে পারে।

কোন ব্যক্তিকে PTSDআক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য তার মাঝে কিছু উপসর্গ চিহ্নিত করতে হবে। এই উপসর্গগুলো অন্তত এক মাস বা তার অধিকসময় স্থায়ী হলে এবং তা ব্যক্তিরস্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ালে তাকে PTSD আক্রান্ত বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

এই রোগের চিহ্নগুলো নিম্নরুপ ঃ

- ঘটনাটি মনে পড়লে ব্যাক্তি শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিক্রিয়া করে এবং সাধারণত দুঃস্বপ্ন, মনখারাপ, করা চিন্তা অথবা Flash back এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তিরই বেদনাদায়ক/ ভয়াবহ অভিজ্ঞতা মনে পড়ে।
- যে সমস্ত ঘটনা, অবস্থা, কাজ ও পারিপার্শ্বিকতা ব্যক্তির ঐ নেতিবাচক অভিজ্ঞতাকে মনে করিয়ে দেয় যেগুলো থেকে দূরে থাকতে চায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি প্রতিক্রিয়াহীন হয়ে পড়ে এবং পূর্বস্মৃতি মনে করতে পারে না।
- প্রাত্যহিক কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং নিঃসঙ্গবোধ করে PTSD আক্রান্ত ব্যাক্তি সাধারণত ভবিষ্যত নিয়ে ভালো কিছুর সম্ভাবনা সম্পর্কে ভাবতে পারেনা।
- PTSD আক্রান্ত ব্যাক্তি সবসময় অতি উদ্বেগগ্রস্থ থাকতে পারে। তাদের কেবলি মনে হয় যে, দুর্ঘটনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা সচেতন থাকা প্রয়োজন। ফলে ঘুমের সমস্যা, মেজাজ খিটমিট করা, মনোযোগের অভাব, অতিমাত্রায় আহার করা এবং দ্রুত রোগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো ইত্যাদি তাদের মধ্যে দেখা দেয়। মাথার যন্ত্রণা, হজমের গন্ডগোল, ঘুমের সমস্যা, রোগ প্রতিরোধের অভাব, বুকের ব্যথা ইত্যাদি এদের ক্ষেত্রে খুবই বেশি দেখা যায়।
- ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সাথে সাথে খুব দ্রুত ব্যক্তিকে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনার সুযোগ করে দিলে রোগ উপসর্গগুলো কিছুটা কমাতে সহায়তা করে।

বিভিন্ন বয়সে মানসিক সমস্যা

মানসিক সমস্যা যেমন বিভিন্ন ধরনের হয় তেমনি বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী বা বয়স ভেদে সমস্যার ধরণও বিভিন্ন হয়ে থাকে।

বয়স ভেদে মানসিক সমস্যাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে ঃ

(১) শিশুদের সমস্যা

(২) প্রাপ্তবয়স্কদের সমস্যা

(৩) বয়স্ক ব্যক্তিদের সমস্যা

১. শিশুদের মানসিক সমস্যাকে আবার বয়সের ক্রম অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। জন্মের পর থেকে ১২ এবং ১৩ থেকে ১৮।

আসলে শিশুদের ক্ষেত্রে মানসিক সমস্যা না বলে আবেগীয় আচরনগত সমস্যা বললে ভালভাবে বোঝা সম্ভব হয়। আচরনগত সমস্যার মধ্যে আছে অতিরিক্ত চপলতা, অত্যধিক জিদ করা, অবাধ্যতা, অপরাধ প্রবনতা, চুরি করা, খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করা, অন্যকে মারধর করা, বিছানায় প্রসাব করা রাগ, তেতলামী, অতিরিক্ত ভয় বা নার্ভাসনেস, বিষন্নতা, স্কুলে না যাওয়া বা স্কুল ভীতি, পড়াশোনা সংক্রান্ত সমস্যা, ব্যথা (মাথা ব্যথা বা পেট ব্যথা) অটিসম ইত্যাদি।

২. প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ যাদের বয়স ১৮ থেকে ৫৫/৬০ এর মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে যেসব মানসিক সমস্যা দেখা যেতে পারে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ অতিরিক্ত ভয় এবং দুঃশ্চিন্তা, বিষন্নতা, সামাজিক ভীতি, শুচিবায়ু বা অতিরিক্ত খুতখুতে স্বভাব, আন্তঃব্যক্তিক অর্থাৎ অন্যান্যদের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে অসুবিধা বা অপারগতা, আত্যহত্যার প্রবনতা, মাদকাসক্তি, মানসিক কারণে যৌন সমস্যা, ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে মাথা ব্যথা বা শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যথা

৩. বয়স্ক ব্যক্তিদের সমস্যায় দেখা হয়, যারা ৬০ বছরের উপরে যাদের বয়স এবং তারা যেসকল মানসিক সমস্যা আক্রান্ত বা সম্মুখীন হয়, যেমন- নারীদের মেনোপজকে ঘিরে মানসিক অবস্থা, ডিমেনসিয়া, আলঝেইমার-সহ অন্যনা মানসিক রোগ। এছাড়াও, কাজে অবসর, বাড়ীতে একা থাকা, সংগীর মুত্যু, দেখাশোনার কেউ না থাকা, ওষুধ বা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা না থাকা-সহ নানাবিধ পারিবারিক বা সামাজিক বিষয়ে ব্যক্তি মানসিক সমস্যায় পড়ে থাকেন, যার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।

অধিবেশণ-৪ ঃ একজন সেবা প্রদানকারীর ব্যক্তিগত এবং পেশাগত বৈশিষ্ট্য

অধিবেশণের উদ্দেশ্য ঃ

এই সেশন শেষে আপনি জানতে পারবেন-

১. **একজন সেবা প্রদানকারীর কি কি ধরণের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন**
২. **জানার পরে আপনার করনীয় কি হতে পারে তা অনুধাবন করতে পারবেন**

নিরিবিলি কিছু সময় ভাবতে পারেন, "আপনার জীবনের আপন একজন ব্যক্তির কথা, যার কাছে গেলে সহজেই আপনার মনের কথাগুলো বলতে পারেন বা পারতেন এবং এক ধরণের শান্তি অনুভূত হয়। ভাবুনতো তার সাথে আপনার সম্পর্ক কি এবং তার কি কি বিশেষ গুণ থাকার কারনে তাকে আপনার ভালো লাগে?"
সাধারণত দেখা যায় সম্পর্কের দিক থেকে তারা হতে পারে ঃ

বন্ধু	মা	বাবা	বোন	ভাই	স্বামী/স্ত্রী	মেয়ে/ছেলে
মামী	খালা	সুপারভাইজার	ফুফু শ্বাশুড়ী	প্রতিবেশী	ইমাম	অন্যান্যরা

আপন হওয়ার জন্য সম্পর্কের গুরুত্ব অনেক, তবে তার থেকেও বেশী প্রয়োজন সেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বা গুণগুলো বোঝার চেষ্টা করা যার জন্য আপনি তার প্রতি সহজ হতে পারেন সহজেই। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেশন থেকে সাহায্য প্রদানকারীদের বৈশিষ্ট্য বা গুণ হিসেবে পাওয়া একটি তালিকা উদাহরন হিসেবে নীচে দেওয়া হলো। আপনি সেগুলোর সাথে নিজের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিতে পারেন।

তবে মনে রাখতে হবে, এই তালিকার বাইরেও আরো অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা একজন সাহায্য প্রদানকারীর থাকতে পারে।

একজন সেবা প্রদানকারীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য

- ধৈর্য্য সহকারে, মন দিয়ে কথা শোনা
- শুনতে শুনতে রেগে যায় না বা রিঅ্যাক্ট করে না
- গুরুত্ব দেয়, সময় দেয় এবং দোষ ধরে না
- বিভিন্ন ধরণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে কি ঘটেছে তা বুঝতে সাহায্য করে
- কথার মাঝে থামিয়ে না দিয়ে যিনি পুরোটা শুনেন
- পক্ষপাতিত্ব না করে যেটা সঠিক সে বিষয়ের
- সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দিয়ে বরং ২/৩ টা পথ বাতলিয়ে দেয়
- সমানুভূতিশীল
- অনেক বেশী আন্তরিক
- পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকা
- সাহসী, মনোবল সম্পন্ন, সহযোগী, অভিজ্ঞ, মমতাময়ী, বাস্তববাদী, স্পষ্টবাদী
- সৎ পরামর্শ দেয়
- ভুল করেছে জেনেও, বিচার না করে

উপর জোর দেন, নিরপেক্ষ থাকা
- গুরুত্বপূর্ণ নয় তারপরও সব কথা শুনেন
- সমস্যা বোঝার চেষ্টা করে এবং কোন গ্যাপ বা ভুল থাকলে তা ধরতে পারে
- জেন্ডার সেনসিটিভ
- মজা করে
- কথা বলার পরিবেশ তৈরী করে দিতে পারে
- পছন্দ-অপছন্দ বুঝে যিনি পাশে থাকেন
- নৈতিকতার দিক থেকে যিনি উন্নত
- যিনি অপেক্ষা করেন এবং আদরে আগলে রাখেন
- যিনি দিনে একবার অন্তত খোঁজ নেন, কেমন আছি

খোলামেলা আলোচনা করার পরিবেশ তৈরী করে দেন
- বিশ্বস্থতার সাথে শেয়ার করা কথাগুলো গোপন রাখা
- স্বতস্ফূর্ত থাকে এবং সহজেই উদ্বুদ্ধ করতে পারে
- অবহেলা বা উপেক্ষা করে না
- বিবেচনা করা, ছাড় দেওয়ার মানসিকতা সম্পন্ন এবং নমনীয়
- অহেতুক অজুহাত দেখায় না
- মন খারাপ থাকলে বুঝতে পারে এবং মন ভালো করার ব্যবস্থা করে
- জীবনের ব্যক্তিগত গোপন কথা নির্ভয়ে বলতে পারার পরিবেশ করে দেন

সাধারণত দেখা যায় যে, আমরা এমন কাউকে জীবনে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি যার গুণাবলী তাকে অন্য ব্যক্তি থেকে আলাদা করে দেয়। যেমন- মডেল ব্যক্তিটি হতে পারেন খুব আন্তরিক, যত্নশীল কিংবা আস্থাশীল, যার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যায়। একই ভাবে আমরা যখন সেবাপ্রদানকারী হিসাবে কাজ করি তখন আমাদেও কাছেও অন্যরা এই রকম প্রত্যাশা করে থাকে। এক্ষেত্রে সেবাপ্রদানকারী হিসেবে আপনি আপনার নিজস্ব গুণাবলী গুলোর দিকে আরো বেশি সচেষ্ট থাকতে পারেন।

অধিবেশণ-৫ ঃ সেবা গ্রহীতার সংগে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং আস্থা স্থাপন করা এবং কেন

অধিবেশণের উদ্দেশ্য ঃ

এই সেশনের শেষে আপনি-

১. প্রত্যেকটি কাজ বা আচরনের পিছনে ব্যক্তির কি বিশ্বাস বা মূল্যবোধ কাজ করে সে সম্পর্কে জানতে পারবেন
২. পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা জানতে পারবেন
৩. সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে বিশ্বাস এবং আস্থার সম্পর্ক তৈরি করা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে পারবেন

ধরুন আপনি একজন অন্ধ ব্যক্তি। আপনার চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে অন্য একজন ব্যক্তি আপনাকে গাইড করে ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরাচ্ছে এবং বিভিন্ন বস্তু স্পর্শ করাচ্ছে। এরপর একটু ভাবুন তো, "সেবা গ্রহনকারী/ অন্ধ ব্যক্তি হিসেবে আপনার কেমন লাগতে পারে" ?

ঠিক একই ভাবে চিন্তা করুন " গাইড বা সেবা প্রদানকারী হিসেবে কি কি অনুভূতি তৈরি হতে পারে"?

সম্ভাব্য অনুভূতি ঃ

গাইড বা সাহায্যকারী হিসেবে দু:শ্চিন্তা, অস্থিরতা, ভয়, শক্তিশালী, দায়িত্বশীল, ভারি ভারি, বিরক্ত ইত্যাদি।

সেবা গ্রহনকারী/ অন্ধ ব্যক্তি হিসেবে- অনিরাপত্তা, অনিশ্চয়তা, ভয়, রাগ,নির্ভরশীলতা,অসহায়,আনন্দ ইত্যাদি।

এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে অনেক সময়ই সাহায্যপ্রার্থী সাহায্যকারীর ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পারে না। তাদের মনে এক ধরনের অজানা ভয় এবং আশঙ্কা কাজ করে। একই ভাবে সাহায্যকারী যথেষ্ট সচেতন থাকার পরও এক ধরনের দু:শ্চিন্তা কাজ করতে পারে সেবা গ্রহীতার আস্থা অর্জন নিয়ে। আস্থার সম্পর্ক তৈরি করার জন্য সেবা প্রদানকারীর সেবা গ্রহীতার অনুভূতি বুঝতে হবে।

সেবা গ্রহীতার প্রতি সম্মানের মনোভাব দেখানো কিভাবে সম্ভব :

- **সেবা গ্রহীতার** এর ব্যাপারে সমালোচনামূলক মনোভাব সম্পূর্ণ বর্জন করে তাকে সহজভাবে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে
- তার সাথে উৎসাহী হয়ে কথা বলতে হবে
- তাকে ঠিকভাবে বোঝার জন্য মনোযোগী হতে হবে
- তাকে তার কোন প্রচেষ্টার জন্য বা কোন অর্জনের জন্য প্রশংসা করতে হবে
- **সেবা গ্রহীতার** এর সাথে সহজ- সরল এবং স্বতস্ফুর্ত আচরন করতে হবে
- **সেবা গ্রহীতার**, যে নিজের সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা রয়েছে সে ব্যাপারে বিশ্বাস রাখতে হবে

শ্রদ্ধা হচ্ছে-

- **একজন মানুষের ভিতরের মর্যাদাকে স্বীকার করা**

- প্রত্যেকটি মানুষই অন্য মানুষ থেকে আলাদা-তা বিশ্বাস করা
- মানতে হবে, প্রত্যেক মানুষের পছন্দ করার অধিকার রয়েছে এবং তার নিজের সমস্যা সমাধানের সেই যোগ্যতা ও ক্ষমতা রয়েছে।

শ্রদ্ধা	কোনটি শ্রদ্ধা নয়
অন্যরা কি বলছে তা মনোযোগ দিয়ে শোনা	সমাধান দেওয়াই উদ্দেশ্য
সমব্যথী হওয়া	উপদেশ বা বক্তৃতা দেওয়া
যার সংগে কথা বলবো তার তালের সংগে মিলিয়ে কথা বলা	অধৈর্য্য হয়ে বা তাল না মিলিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো কথা বলা
তাদের সক্রিয় এবং শক্তিশালী দিকগুলোর উপর জোর দেওয়া	অন্যের কথায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা উপহাস করা
ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয়ে যত্নশীল থেকে ভাষা ব্যবহার করা	করুণা বা দয়া-মায়া করা
ব্যক্তির প্রতি আসলেই অনুরক্ত থাকা বা কোন রকম ভনিতা না করা	হুমকি ধামকি দেওয়া বা ভয় দেখানো

সেবা দান প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ঃ

<u>সেবা গ্রহীতার প্রতি অকৃত্রিম (Genuine) হওয়া কিভাবে সম্ভব ঃ</u>

- নিজেকে পেশাগত আসন থেকে নেমে **সেবা গ্রহীতার** যে স্তরে রয়েছেন সেখানে নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে হবে
- সাহায্যকারী যা বলছেন তা যেন **সেবা গ্রহীতার** এর কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়, সেদিকে খেয়াল করতে হবে
- **সেবা গ্রহীতার** সাথে যতটা সম্ভব খোলামেলা সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। শুধু কৌশল (Technique) এর কথা চিন্তা না করে মানুষটির উপর মনোযোগ দিতে হবে। স্বতঃস্ফুর্তভাবে মুক্ত আলোচনা ক্লায়েন্টকে সহজ হতে সাহায্য করবে।
- **সেবা গ্রহীতার** এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে যদি কোন সমস্যা হয়, তাহলে নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে, "আমার ভেতরে কি এমন কিছু ঘটছে, যা আমাকে **সেবা গ্রহীতার** এর প্রতি আগ্রহী করে তুলছে না"? **সেবা গ্রহীতার** এর মধ্যে বিরক্তি বা রাগের অনুভুতি লক্ষনীয় থাকে তাহলেও বোঝার চেষ্টা করতে হবে তার এই অনুভুতিগুলোর পেছনে কি কারন থাকতে পারে। এটা কি সম্পূর্ণভাবে **সেবা গ্রহীতার**

এর নিজস্ব ব্যাপার নাকি দু'জনের মধ্যে এমন কিছু কথা হয়েছে যার ফলে তার মধ্যে এধরনের অনুভুতির সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারে স্পষ্ট হতে হবে।

সেবা গ্রহীতার <u>সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিভাবে সুস্পষ্টতা ও প্রাসঙ্গিকতা (Concreteness) প্রয়োগ করা যায় ঃ</u>

- **সেবা গ্রহীতার** এর কথাবার্তা যদি অস্পষ্ট মনে হয় তাহলে সাহায্যকারীকে চেষ্টা করতে হবে সেগুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তার সামনে তুলে ধরতে।
- **সেবা গ্রহীতার** যা বলছে, সেটা তার সমস্যার সাথে কতটা প্রাসঙ্গিক সেটা জানতে হবে। সাহায্যকারীকে চেষ্টা করতে হবে আলোচনার বিষয়বস্তুটি যেন যথাসম্ভব সমস্যার সাথে সম্পর্কিত হয় সেই চেষ্টা করা। যদি মনে হয় সাহায্যপ্রার্থীর কথা ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না, তাহলে প্রয়োজনে তাকে কথার মাঝে থামিয়ে ব্যাপারটি আরো স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করতে হবে।
- কোন বিশেষ ঘটনার উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করার জন্য **সেবা গ্রহীতাকে** বলা যাবে। কিন্তু অবশ্যই খেয়াল করতে হবে সেটা যেন সরাসরি প্রশ্ন না হয়। কোন বিষয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে যখন সাহায্যপ্রার্থী অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তখন তাকে উপস্থাপনে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বিষয়টি গভীরে যাবার জন্য তাকে সাহায্য করতে হবে।
- আলোচনার বিষয়বস্তু প্রাসঙ্গিক হচ্ছে কি না সেটা বোঝার জন্য সাহায্যকারী নিজের অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করবেন।

আমার সাথে কথা বলা কতটা নিরাপদ ?

আমার সাথে কথা বললে আপনি কত ঘন ঘন নিম্নলিখিত ধরনের প্রত্যুত্তর দেন ?

প্রতিটি ধরনের প্রত্যুত্তর কতবার দেন সেগুলিকে/তাকে ০ থেকে ৪ নম্বর প্রর্যন্ত ভাগে ভাগ করুন যেমন ঃ

০	১	২	৩	৪
কখনো না	কদাচিৎ	কখনও কখনও	প্রায়শই	বেশ ঘন ঘন

১. চালনা করেন ও দিক নির্দেশ করেন	১১. বলেন আমার কোন সময় নেই
২. বিচার করেন ও মূল্যনির্ধারন করেন	১২. নির্দিষ্ট সময় দেখা করতে দেরী করেন
৩. দোষারোপ করেন	১৩. লোককে অগ্রাহ্য করেন
৪. নীতি উপদেশ দান করেন ও আদেশ দেন	১৪. অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন
৫. মনের জোর যোগান দেন	১৫. নিশ্চুপ থাকেন
৬. অন্যের অনুভুতি স্বীকার করেন না	১৬. চিৎকার করে উঠেন
৭. উপদেশ দেন ও শেখান	১৭. লোককে হেয় প্রতিপন্ন করেন
৮. জিজ্ঞাসা করতে থাকেন	১৮. লোককে দুরে সরিয়ে দেন
৯. বিরক্তি দেখান	১৯. সহানুভূতি প্রকাশ করেন
১০. নিজের সম্বন্ধে কথা বলতে থাকেন	২০. রুঢ় ভাষা ব্যবহার করেন

এই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে আপনি সেবা গ্রহীতার কথা কতটা বিশ্বাসের সাথে রক্ষা করতে পারেন তা বুঝতে পারবেন ঃ

বিশ্বাস রক্ষা এবং আপনি

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো পড়ে, আপনার কি প্রতিক্রিয়া হলো সংক্ষেপে লিখুন-

১. সেবা গ্রহীতা যদি আপনার কাছে এমন কিছু বলে, যা অপর কাউকে বিপদে ফেলতে পারে তখন আপনি কি করবেন ?

.....

২. সেবা গ্রহীতা কথা যে বিশ্বাষযোগ্য তা আপনি কি করে বুঝবেন ?

.....

৩. যদি সেবা গ্রহীতা এমন কিছু বলে, যা আপনার কাছে অশালীন বা অশোভনীয়, তখন আপনি কি করবেন ?

.....

৪. সেবা গ্রহীতা আপনাকে যা বলছেন, তার দায়িত্ব আপনি কতটা নেবেন ?

.....

৫. বিশ্বাষ রক্ষার ক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব অনুভূতি সম্পর্কে আপনি কার সাথে আলোচনা করেন ?

.....

৬. আপনার মূল দায়িত্ব কার প্রতি ?
আপনার মালিক/সেবা গ্রহীতা /অন্যান্য সহকর্মী/পরিবার বা অন্য কেউ/নিজের প্রতি

.....

আমাদের সেবা গ্রহীতার সব কথা সব সময় গোপন রাখতে হবে। কিন্তু যদি দেখেন সেবা গ্রহীতা নিজের জীবনের বা অন্যের জীবনের ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন তখন গোপনীয়তা ভেঙ্গে বিষয়টি তার কাছের মানুষকে জানাতে হবে। সেবা গ্রহীতার কথা সবসময়ই বিশ্বাস করতে হবে। সেবা গ্রহীতাকে নিয়ে আপনার নিজস্ব কোন অনুভূতি যদি তৈরী হয় তা হলে আপনার সুপারভাইজারের সাথে গোপনীয়তা বজায় রেখে আলোচনা করতে পারেন। সব সময় মনে রাখতে হবে, আপনার বিশ্বাস, মনোভাব, মূল্যবোধ এবং অকৃতিমতা নিয়ে সেবা গ্রহীতার সাথে আস্থার সম্পর্ক তৈরী করা, যা সেবা প্রদানকারী হিসেবে আপনার মূল দায়িত্ব।

অধিবেশণ-৬ ঃ সেবা গ্রহীতার সংগে একটি সফল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রয়োজনীয়তা

অধিবেশণের উদ্দেশ্য ঃ

এই সেশন শেষে আপনি-

১. মানব যোগাযোগ কি এবং কত প্রকার জানবেন
২. এর সংগে সংশ্লিষ্ট দক্ষতাগুলো জানবেন এবং শিখবেন
৩. একজন সেবা প্রদানকারী হিসেবে এই দক্ষতাগুলো ব্যক্তি এবং কর্মজীবনে প্রয়োগের কার্যকারিতা বিষয়ে অনুপ্রেরণা পাবেন

যোগাযোগ ঃ

দু'জন ব্যক্তির মাঝে যখন ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয় তখন তাকে মানব যোগাযোগ বলা হয়। যে উদ্দেশ্যে এই যোগাযোগ করা হলো, তা যদি দু'জনের কাছে পরিষ্কার এবং স্পষ্ট থাকে তাহলে সেই যোগাযোগকে অনেকাংশে সফল বলা যায়।

সাধারণত দু'ভাবে আমরা একে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকি। যথা-

১. বাচনিক যোগাযোগ এবং
২. অবাচনিক যোগাযোগ

বাচনিক যোগাযোগ ঃ

কথা বলার মাধ্যমে যখন একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে ভাবের আদান প্রদান করে সম্পর্ক স্থাপন করে তখন তাকে বলা হয় বাচনিক যোগাযোগ। যেমন- "আপনি কেমন আছেন?"

অবাচনিক যোগাযোগ ঃ

কথা না বলে কেবল অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি যখন অপর একজন ব্যক্তির সাথে ভাবের আদান প্রদান করে থাকে তখন তাকে বলা হয় অবাচনিক যোগাযোগ। যেমন- দুই হাত দিয়ে ইশারায় বলা, "কেমন আছেন?"

বাচনিক এবং অবাচনিক যোগাযোগ দক্ষতা ঃ

আলাদাভাবে যোগাযোগ দু'রকমের হলেও, সাধারণভাবে বলতে গেলে একটি মানব যোগাযোগকে সফল হতে হলে এই দু'ধরণের যোগাযোগেরই একটি সার্বিক সম্মিলনের প্রয়োজন হয় এবং এর সাথে প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলোরও প্রয়োগ করতে হয়। ৬.১-হ্যান্ডআইটে আপনি বাচনিক এবং অবাচনিক যোগাযোগ করার কিছু দক্ষতা সম্পর্কিত তথ্য পড়তে এবং জানতে পারবেন।

একে অপরের সাথে যোগাযোগের তিন রকমের ভঙ্গিমা হতে পারে-

১. এ্যগ্রেসিভ ভঙ্গিমাঃ- নিজের সুবিধা-অসুবিধা, বক্তব্য, ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রকাশ করা হয় এমন ভাবে যে সেটা অপরকে আঘাত করে। এর অন্তর্নিহিত বার্তা হলো আমি ঠিক, আমি অধিকতর উচ্চস্তরে আছি, তুমি ভুল, তুমি আমার তুলনায় নিচু স্তরে আছো। এ্যগ্রেসিভ আচরণ করলে একটা সুবিধা আছে যে,

- নিজের ইচ্ছামত কাজ অনেক সময়েই করিয়ে নেওয়া যায়
- অন্যলোক বিরক্ত হয়ে বা ভয় পেয়ে তার কথা মেনে নেয়
- কিন্তু অন্যদিকে মানুষের সাথে তাদের সুসম্পর্ক তৈরি হয় না লোকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে, নয়তো তাদের সঙ্গে খোলামেলাভাবে মেশে না পাছে বিবাদ বা সংঘর্ষ হয়

২. প্যাসিভ ভঙ্গিমাঃ- নিজের বক্তব্য সুবিধা-অসুবিধা ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রকাশ করে না। করলেও পরোক্ষভাবে করে বা সম্পূর্ণ করে না। এর অন্তর্নিহিত বার্তা হলো, আমি দূর্বল, তুমি আমার তুলনায় উচ্চস্তরে ও ক্ষমতাবান, তুমি ঠিক। এই ভঙ্গিমার একটা সুবিধা হল,

- এর দ্বারা নিজের মত অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া যায়
- ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করার প্রয়োজন হয় না
- কিন্তু অন্যদিকে দম বন্ধ হয়ে আসে
- নিজের চাহিদা মেটানো যায় না বলে ভিতরে ভিতরে রাগ হয়

৩. এ্যসারটিভ ভঙ্গিমাঃ- নিজের বক্তব্য, সুবিধা-অসুবিধা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করে অন্যকে আঘাত না করে। এর অন্তর্নিহিত বার্তা হলো তোমার সঙ্গে আমার মতামত এর পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু একে অপরের কাছে মতামত প্রকাশ করার সমান অধিকার আছে। এই ভঙ্গিমায় সুবিধা হল,

- সক্রিয়ভাবে আলোচনায় ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করা যায়,
- অন্যকে আঘাত প্রদান না করে নিজের চাহিদা পূরণ করা যায়
- সসম্মানে ও সুষ্ঠুভাবে মতামত ও অনুভূতি আদান-প্রদান করা যায়
- নিজের আত্মবিশ্বাস রক্ষা করা যায়

পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের গুরুত্ব আরোপ করতে হবে ঃ

১. শারীরিক ভাষার মাধ্যমে (BODY LANGUAGE)ঃ আমরা দেহভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গিমা, মুখভঙ্গিমা ও দেহের শিহরণ বা কম্পন দ্বারা আমাদের না বলা কথার অনেকটাই অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারি।

২. কণ্ঠস্বরের দ্বারা (VOICE)ঃ কণ্ঠস্বরের ওঠানামা, দ্রুততা, সাবলীলতা, তীক্ষ্ণতা, প্রকাশ ভঙ্গিমায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে এবং আমাদের বক্তব্য তাৎপর্যমন্ডিত করে তোলে হাসি-কান্না, তর্জন-গর্জন, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি নির্দিষ্ট কয়েকটি আবেগের মতই।

৩. শব্দ প্রয়োগ বা যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে (WORDS)ঃ আমাদের চিন্তা ভাবনা এবং অনুভূতির যথার্থ প্রকাশ সম্ভব হয় সঠিক শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে। অনেক সময় দেখা যায় আমাদের মুখের কথা ও প্রকাশিত ভাব যা আমাদের গলার স্বর বা অঙ্গভঙ্গিমার দ্বারা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে পারস্পরিক সংহতি বজায় রাখতে পারে না।

সুতরাং পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সময় আমরা সতর্ক থাকব সঠিক শব্দ ব্যবহারের ও আমাদের (Non verbal) অবাচনিক প্রকাশভঙ্গিমার মধ্যে যেন কোনও বৈপরীত্য না থাকে। তাছাড়া পর্যবেক্ষক (Observer) হিসেবে আমাদের সতর্ক ও সংবেদনশীল (Sensitive) হওয়া প্রয়োজন, যখন আমরা আরেকজনের প্রকাশিত মনোভাবকে বোঝার চেষ্টা করছি এর দ্বারা আমরা নিশ্চিত হতে পারি প্রকাশিত ভাবটি সঠিকভাবে আমাদের বোধগম্য হয়েছে এবং আমরা যথার্থভাবে উত্তর দিতে পেরেছি।

বাচনিক এবং অবাচনিক যোগাযোগের কিছু দক্ষতাসমূহ

সাহায্যকারী বাচনিক আচরন

- সহজ সরল বোধগম্য শব্দ ব্যবহার করবেন
- ব্যক্তির নাম ব্যবহার করবেন (যেমন- "রফিক, আপনি....."
  "রেশমা, আপনি....."
- বিচার করে কথা বলবেন না (যেমন-আপনি তাকে বকা দিয়েছিলেন বলেই আপনার আজ এই পরিনতি হলো)
- ব্যক্তির কথাগুলো স্পষ্ট করে তাকে পুনরায় বলবেন এটা বোঝাতে যে আপনি তার কথা ঠিকমতো শুনে বুঝতে পেরেছেন
- সারমর্ম আকারে কথা বলার চেষ্টা করবেন এবং মূল বক্তব্য বলার চেষ্টা করবেন
- ব্যক্তির কথার সাথে সংগতি রেখে কথা বলবেন
- উৎসাহমূলক কথা/শব্দ ব্যবহার করবেন, যেন ব্যক্তি কথা বলার উৎসাহ পায়। যেমন- "আচ্ছা, হুম, হ্যা, জ্বি ইত্যাদি", তবে উহু, আহা জাতীয় শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থাকবেন
- যথাযথ/সঠিক এবং বাস্তব সম্মত ব্যাখ্যা দিবেন, কোন মনগড়া বা অনুমান করে কথা না বলাই শ্রেয়
- কখনও কখনও একটু মজা করে কথা বলা, অনেক সময় এতে পরিবেশ হালকা হয়

সাহায্যকারী অবাচনিক আচরন

- ব্যক্তির কণ্ঠস্বরের সাথে মিলিয়ে কথা বলবেন
- ব্যক্তির চোখের দিকে তাকাবেন
- মাঝে মাঝে মাথা নাড়াবেন
- নিজের মুখভঙ্গির মাধ্যমে বোঝাবেন যে তাকেই আপনি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছেন
- অবস্থা বুঝে হাসিখুশী মুখ রাখা কেননা আপনার কাছ থেকে তিনি একধরনের শক্তি পেতে পারেন
- ব্যক্তির কাছাকাছি বসবেন (৩০-৩৯ ইঞ্চি)
- সামনের দিকে ঝুঁকে কথা বলুন
- স্পর্শ না করাই ভালো, তবে বয়স এবং সমলিংগের হলে প্রয়োজনে শরীরের অপেক্ষাকৃত কম সংবেদনশীল অংশে স্পর্শ করা যাবে। যেমন-পিঠের মাঝে ঘাড়ের অংশে, হাটুর একটু উপরে, মাথার উপরে ইত্যাদি

ক্ষতিকর বাচনিক আচরন

- উপদেশ দেওয়া
- জোর করে চাপিয়ে দেওয়া
- আবদার করে ভূলিয়ে ভালিয়ে রাখা
- কোন কিছু করার জন্য জোর করা
- দোষারোপ করা
- খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা বের করা
- কঠিন বা বোধগম্য নয় এমন ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করা
- মূল বিষয় থেকে সরে যাওয়া বা সহজেই বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা
- অনুভূতিকে প্রাধান্য না দিয়ে কথা বলা
- অতিরিক্ত বিশ্লেষন করা

ক্ষতিকর অবাচনিক আচরন

- ব্যক্তির দিকে না তাকানো
- অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসা
- নাক সিটকানো
- ভ্রু কুঁচকানো
- মুখ গোমড়া করে রাখা
- কঠিন/শক্ত মুখভঙ্গী ধওে রাখা
- আঙ্গুল নাচিয়ে কথা বলা
- ভিন্ন রকম অঙ্গভঙ্গী করে মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটানো
- হাই তোলা
- চোখ বন্ধ করে রাখা
- অপ্রীতিকর কণ্ঠস্বরে কথা বলা
- কথা বলার গতি স্বাভাবিকের তুলনায় দ্রুত বা ধরি করা

অধিবেশণ-৭ ঃ মনোযোগ সহকারে কথা শোনা

অধিবেশণের উদ্দেশ্য ঃ

এই সেশনের শেষে আপনি-

১. মনোযোগ দিয়ে কথা শোনার ক্ষেত্রে কোন দক্ষতাগুলোর প্রয়োজন হয় তা জানতে এবং শিখতে পারবেন
২. মনোযোগ দিতে বাধাঁ আসতে পারে, সেই বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন

মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করে, খোলা মনে শোনা বা 'শ্রবণ' করা যোগাযোগের প্রধান একটি উপাদান। মনোযোগ সহকারে শোনা বলতে শুধুমাত্র কথা বা বলা হয়েছে এমন অংশ শোনা বোঝায় না। এখানে শোনা মানে-

- কান দিয়ে শোনা
- চোখ দিয়ে দেখা এবং
- মন দিয়ে বোঝা

যা মুখে বলা হচ্ছে এবং যা মুখে না বলে বিভিন্ন আচরন এবং দেহের ভঙ্গি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে-এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে। শুনতে হবে, যা মুখে বলছে, যা বলছে না এবং তার নিশ্চুপ সময়ের না বলা কথাও। সেবা প্রদানকারী হিসেবে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে-মুখের অভিব্যক্তি, গলার স্বরের ওঠানামা, এবং তীক্ষ্ণতা, কথা বলার ধরণ-আস্তে না কি তাড়াতাড়ি, সাজ পোষাক, চেহারা ইত্যাদি। চুপ করে থাকার মাধ্যমেও সেবা গ্রহনকারী তার মনের অবস্থা বোঝাতে পারেন, সেদিকেও খেয়াল রাখবেন।
বলা হয়েছে এমন অংশ শোনার সময় সেবা প্রদানকারী হিসেবে, নিজের পছন্দ, অপছন্দ, নীতি-আদর্শ, সংস্কার ইত্যাদি আলাদা করে রাখতে হবে। নিজের ইচ্ছেমতো অংশ শুনলে হবে না। কথা বলার সময় ব্যক্তির অনুভূতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেবা গ্রহনকারী এক কথা বার বার বললেও আপনাকে সেগুলো ধৈর্য্য এবং আগ্রহ সহকারে শোনা প্রয়োজন।

ভালো করে শুনলে সেবা গ্রহনকারীকে-

- ✓ নিজের অনুভূতি বুঝতে, অনুভব করতে ও প্রকাশ করতে সাহায্য করে
- ✓ নিজেকে নিজে সাহায্য করার কৌশল শেখায়
- ✓ কঠিন পরিস্থিতিতে নিজের দায়িত্ব নিতে ও সমস্যা সমাধান মূলক দৃষ্টিভঙ্গী আনতে সাহায্য করে
- ✓ নিজেকে গুটিয়ে ফেলার প্রবণতা কমাতে সাহায্য করে

কোন একজন ব্যক্তি, কোন পরিবার ভুক্ত কেউ, বন্ধু, সহকর্মী, উর্দ্ধতন বা অধীনস্থ কর্মচারী এবং বিশেষতঃ একজন সেবা প্রদানকারী যখন আরেকজন সেবা গ্রহনকারীর সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ কথাবার্তা বা পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে সাহায্য করেন, সেই ব্যক্তির প্রয়োজন অন্যকে মনোযোগ দেয়ার ব্যাপারে সংবেদনশীল হওয়া ।

মনোযোগ দেওয়ার বিশেষ পদ্ধতি, আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবো কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে ঃ
ক) কিভাবে আমরা বসবো যখন অন্যের প্রতি আমরা মনোযোগ দিব? আমরা অবশ্যই মুখোমুখি বসবো, আরামে, পরস্পরের কাছাকাছি, আমরা চাইব আমাদের মাঝখানে কোনও বড় আসবাব ব্যবধান সৃষ্টি না করে।
খ) আমাদের দেহের ভঙ্গিমা অবস্থান কিরকম হবে? আমরা অবশ্যই সামনের দিকে ঝুঁকে বসবো পিছনের তুলনায়। হাত দুটি বুকের উপর বা পিছনের দিকে না রেখে মুক্ত রাখব বন্ধুত্ব সুলভ ভঙ্গিমায়। আমাদের দেহভঙ্গিমা যেন এই বার্তাই পৌঁছে দেয় যে আমি খোলা মন নিয়ে বন্ধুত্বসুলভ ও অবিভক্ত মনোযোগ সহকারে তোমার কথা শুনবো।
গ) তখন আমার দৃষ্টি কোন দিকে নিবদ্ধ করব? আমরা কি মাটির দিকে, ছাদের দিকে বা জানালার বাহিরে তাকিয়ে আমাদের সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলব? উত্তর হবে না। আমরা অবশ্যই আমাদের সঙ্গীর চোখের দিকে তাকাবো, সহজভাবে, তার প্রতি কটাক্ষ বা চাপ সৃষ্টি না করে।
ঘ) আমরা কি উদ্বেগ বা উত্তেজনা পোষন করব? একজন সাহায্যকারীর উচিত কথায় ও দেহভঙ্গিমায় শিথিল থাকা। তবেই সে সাহায্য করতে পারে, তার সঙ্গীকে সহজ ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে। শিথিলতা প্রকাশ পায় মুখভঙ্গিমায় স্বরবৈশিষ্ট্যে, শব্দ ব্যবহারে ও দেহভঙ্গিমায়।

অপরকে মনোযোগ দেয়ার পদ্ধতিটির প্রতি প্রত্যেক সেবা প্রদানকারীকে যত্নবান বা সতর্ক হতে হবে, অনুপযুক্ত অভ্যাসকে কমিয়ে বা বাদ দিয়ে, এবং ভাব বিনিময়ের সময় সঙ্গীর দ্বারা প্রেরিত সংকেত গুলি সংবেদনশীল মনের দ্বারা গ্রহণ করতে হবে।

এ বিষয়ে আপনার নিজের অবস্থান আরো ভালোভাবে বুঝে নিতে, ৭.১ ও ৭.২ -হ্যান্ডআইট দেখুন, পড়ুন এবং নিজের অবস্থান মিলিয়ে নিন।

৭.১-হ্যান্ডআইট

আমি যখন কারো কথা শুনি, তখন নীচের উক্তিগুলো কতটা আমার ক্ষেত্রে ঘটে, তা মিলিয়ে নেই ঃ

	উক্তিগুলো	কতবার		
		খুব কম	মাঝে মাঝে	প্রায়শই
১.	অন্যের কথা শুনতে শুনতে নিজের জগতে হারিয়ে যাই।			
২.	বক্তার বিষয়বস্তুতে আগ্রহ না পেলে মনোযোগে ব্যঘাত ঘটে।			
৩.	অন্যের কথা একটানা শুনতে গেলে হাই উঠতে শুরু করে।			
৪.	শোনার সাথে সাথে নিজের মনে বক্তব্যের একটা মানে বা ব্যাখ্যা আপনা থেকেই চলে আসে।			
৫.	অন্যের কথা শোনার মধ্যে কোন আনন্দ পাই না।			
৬.	শোনার চেয়ে কথা বলতে বেশী অভ্যস্ত।			
৭.	নিজের চিন্তা-ভাবনার সাথে বক্তার চিন্তা-ভাবনা না মিললে বিরক্ত লাগে, কেমন যেন একটা উৎকণ্ঠা হয়।			
৮.	শুনতে শুনতে মনে হয় কখন নিজের চিন্তা বা বক্তব্য বক্তার সাথে শেয়ার করবো।			
৯.	বক্তার সাথে কোনো ঘটনা/চিন্তা মিলে গেলে সে বিষয়ে সংগে সংগে বলতে ইচ্ছে হয় এবং সেটা করি।			
১০	অন্যের কথা একটানা শুনতে গেলে মনোযোগের ব্যঘাত ঘটে।			
১১.	বক্তার নৈতিকতা বা মূল্যবোধ আমার থেকে ভিন্ন হলে শুনতে অসুবিধা হয়।			
১২.	অনেকে একসাথে কথা বললে আমার বিরক্ত লাগে।			
১৩.	বক্তা যদি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে আমার শুনতে ভালো লাগে না।			
১৪.	আমি ক্লান্ত থাকলে অন্যের কথা শুনতে ইচ্ছা করলেও মন দিতে পারি না, বিরক্ত লাগে।			
১৫.	মাথার মধ্যে কাজের তাড়া থাকলে মন দিয়ে কথা শুনতে একধরণের চাপ হয়।			
১৬.	যাকে আমি পছন্দ করি না, তার কথা শুনতে আগ্রহ পাই না, বিরক্ত লাগে।			

দশ (১০) ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী যা মনোযোগ সহকারে শোনার ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করে ঃ

১. অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস (উদাহরণ পাশে দেওয়া হলো)	এ ধরনের ব্যক্তিরা সাধারনত বিশ্বাস/মনে করে, "আমিই সঠিক আর অন্য ব্যক্তিটি ভুল।" তাই অন্য ব্যক্তিটি কি ভাবছেন বা অনুভব করছেন তা না ভেবে বা বোঝার চেষ্টা না করে সবসময় নিজের বক্তব্য সঠিক তা প্রমাণ করতে বেশী ব্যস্ত থাকেন এবং তাতে প্রায়ই সরাসরি রাগও প্রকাশ করে ফেলেন। (নিজের অবস্থান ভাবুন এবং লিখে ফেলুন)
২. স্বার্থপরতা	(নিজের অবস্থান ভাবুন এবং লিখে ফেলুন)
৩. অতিরিক্ত প্রত্যাশা	(নিজের অবস্থান ভাবুন এবং লিখে ফেলুন)
৪. অবিশ্বাস	(নিজের অবস্থান ভাবুন এবং লিখে ফেলুন)
৫. সাহায্য করার প্রতি আসক্তি	(নিজের অবস্থান ভাবুন এবং লিখে ফেলুন)
৬. দোষারোপ করা	(নিজের অবস্থান ভাবুন এবং লিখে ফেলুন)
৭. নিজের প্রতি প্রতারণা	(নিজের অবস্থান ভাবুন এবং লিখে ফেলুন)
৮. নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাওয়ার ভয়	(নিজের অবস্থান ভাবুন এবং লিখে ফেলুন)
৯. নিজের সমালোচনা নিতে না পারা	(নিজের অবস্থান ভাবুন এবং লিখে ফেলুন)
১০. নিজেকে ঠকে গেলাম মনে করা	(নিজের অবস্থান ভাবুন এবং লিখে ফেলুন)

অধিবেশণ-৮ ঃ সেবা গ্রহীতার কথায় যথাযথভাবে সাড়া দেওয়া এবং প্রতিক্রিয়া করা

অধিবেশণের উদ্দেশ্য ঃ

এই সেশনের মাধ্যমে আপনি-

১. প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা কি এবং এর প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন
২. নিজেদের এবং অন্যের প্রতিক্রিয়ার ধরন চিহ্নিত করতে পারবেন
৩. স্বাভাবিকভাবে আমাদের মধ্যকার যে সকল প্রতিক্রিয়া করার প্রবণতা চলে আসে তা বুঝতে শেখা এবং প্রতিক্রয়া করতে লক্ষণীয় দিক সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা

সাড়া দেওয়া ঃ

সেবাগ্রহীতার সাহায্যের জন্য যখন আসবেন, তখন সেবাপ্রদানকারীর তার কথায় সাড়া দেওয়া, কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। যথাযথ সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা বোঝেন যে, তার কথা শোনা হয়েছে এবং বোঝা হয়েছে, ফলে সে আরও কথা বলতে উৎসাহী হয়।

সেবাপ্রদানকারীর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন, মুখের চেহারা দিয়ে তা প্রকাশ করা যায়, উত্তর দেবার সময় গলার স্বর (চড়া বা নরম) দিয়ে প্রতিক্রিয়া বোঝানো যায়, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে, তাছাড়া কথা বলে তো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা যায়ই।

প্রতিক্রিয়া, ঠিক কি রকমের হবে সেটা নির্ভর করে প্রতিক্রিয়াকারী বা সেবাপ্রদানকারীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদ্দেশ্যের ওপর। প্রধানতঃ পাঁচ রকমের (EIPSU) প্রতিক্রিয়া হতে পারে;

১. মূল্যায়নসূচক উক্তি (EVALUATIVE) ঃ ঠিক/ ভুল, ভাল/ মন্দ ইত্যাদির বিচার করা।
২. বিশ্লেষণমূলক উক্তি (INTERPRETATIVE) ঃ কোন বক্তব্য বা সমস্যার একটা মানে বিশ্লেষণ করা
৩. প্রশ্নমূলক উক্তি (PROBING) যার দ্বারা সূত্র ধরিয়ে দেওয়া হয় ঃ আরও কিছু জানতে চাওয়া, সেবাগ্রহীতাকে নিজের কথা শুনতে সাহায্য করা।
৪. ভরসামূলক উক্তি (SUPPORTIVE) ঃ ভরসা যোগানো
৫. বোধগম্য উক্তি হচ্ছে তা বোঝানো (UNDERSTANDING) ঃ সেবাগ্রহীতার থেকে সুনিশ্চিত করা যে তার বক্তব্য সঠিক ভাবে বোঝা হয়েছে।

বোধগম্যসূচক উক্তি সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে। ভরসামূলক উক্তি করার সময় খেয়াল রাখতে হয় যাতে তা নির্ভরতা বাড়িয়ে না তোলে, প্রশ্নমূলক উক্তি সীমা রেখে করা উচিত, যাতে সেবাগ্রহীতা খেই না হারিয়ে ফেলে। বিশ্লেষণমূলক উক্তি খুবই বিপদের কারণ এর দ্বারা কোনো বক্তব্যের ভুল বিশ্লেষণ হয়ে যেতে পারে। মূল্যায়নসূচক উক্তি একেবারেই সাহায্য করে না, বরং অসুবিধা বাড়িয়ে তোলে।

নিচের ৮.১-হ্যান্ডআউটতে ৬ টি পরিস্থিতি আছে। প্রত্যেকটি পরিস্থিতির বিপরীতে ৫টি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া দেওয়া আছে। এবার আপনার কাজ হবে, ঐ ৬ টি পরিস্থিতিতে যে ৫ টি করে প্রতিক্রিয়া দেওয়া আছে তা পড়া এবং

কোনটা কোন ধরণের প্রতিক্রিয়া তা চিহ্নিত করা। আশা করি, কাজটি করে আপনি বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।

যথাযথ ও আদর্শভাবে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ৩ টি উপাদান খুবই জরুরী ঃ-

১. বিষয় (CONTENT) ঃ ঠিক ঠিক কথার ব্যবহার করা। মুখে না বলে আকারে, ইঙ্গিতে বোঝানো বক্তব্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া।

২. গভীরতা (DEPTH) ঃ বক্তব্যের গভীরতা/ ছাড়া ছাড়া ভাব খেয়াল করা।

৩. অর্থ (MEANING) ঃ সাড়া দেওয়ার সময়- সাহায্যপ্রার্থীর বক্তব্যর অর্থ ও বিষয় হ্রাস পেলে বা নতুন অর্থ যোগ হলে চলবে না।

এখন যদি আমরা নিজেদের এবং আমাদের চারপাশের ঘনিষ্ঠ পরিচিত লোকদের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে অন্যে কি বলছে তার ওপর বেশীরভাগ সময়ই আমাদের বিচারমূলক প্রতিক্রিয়া হয়, নয়তো সেই বক্তব্যে আমরা আরো অন্য অর্থ যোগ করি। প্রশ্ন আমরা সাধারনত কম করি, অন্যের অনুভুতির প্রতি সংবেদনশীল না হয়েই মন্তব্য করি বা উপদেশ দেই। সাহায্যকারী হিসেবে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া সাহায্যপ্রার্থীকে মোটেই সাহায্য করবে না তা কমানো দরকার, যদিও আমরা সম্পূর্ণ ভাবে এ ধরণের প্রতিক্রিয়াগুলো বাদ দিতে পারিনা। আমরা যদি নিজেদের কে সাহায্যপ্রার্থীর জায়গায় বসাতে পারি, এবং যদি সাহায্যপ্রার্থীর অনুভুতিকে অর্থাৎ তার কি হচ্ছে বুঝতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে যথাসময়ে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া তার পক্ষে উপকারী। সহানুভুতিসম্পন্ন প্রতিক্রিয়া একটি ভালো সাহায্যপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি হতে পারে।

নিচের ৬টি বক্তব্য পড়ুন। এই বক্তব্য গুলির সাহায্যে একজন মানুষ তার মনের উদ্বেগ ও সমস্যার কথা অপর একজনের কাছে প্রকাশ করেছে। প্রত্যেকটি বক্তব্য'র ৫টী করে উত্তর দেওয়া আছে। যদি বক্তাকে তার সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য সাহায্য করতে চান এবং তার সঙ্গে একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান, তাহলে এই উত্তরগুলির মধ্যে কোনটি আপনি বেছে নেবেন তাতে টিক চিহ্ন প্রদান করুন।

১ । জনৈক ছেলের বক্তব্যঃ
আমি ক্রমশঃ নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছি। কারো সাথে মিশেতে পারি না। সব সময় দুশ্চিন্ড়া হয়। হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরি। মাথা যন্ত্রণা করে। একটা সময় ছিলো যখন আমি সবার সাথে মিশতে পারতাম।
উত্তরঃ

ক) তোমার মধ্যে একটা ভীতি তৈরী হয়েছে- যার জন্য তুমি সবার সাথে মিশতে পারছ না।

খ) আমাকে আরো একটু বুঝিয়ে বল। কবে থেকে এটা শুরু হয়েছে।

গ) তুমি আজকাল আগের মতো কওে মিশতে পার না বলে, তোমার এত দুঃশ্চিন্তা হয়, হতাশ লাগে।

ঘ) যখন লোকজনের সাথে থাকবে, তখন নিজেকে গুটিয়ে নেবে না।

ঙ) দেখ, প্রত্যেকের জীবনেই কখনো না কখনো এ রকম একটা সময় আসে। আমার বিশ্বাস তুমি এটা কাটিয়ে উঠতে পারবে।

২। জনৈকা মেয়ের বক্তব্যঃ
বিয়ে করার জন্য আমার মা-বাবা আমাকে জোর করেছেন। আমি এখনই বিয়ে করতে চাই না। আমি এখন বিয়ের জন্য প্রস্তুতই নই। আমি আরও পড়াশুনা করতে চাই। আমাকে যদি ওঁরা জোর কওে এবং বিয়ে করার জন্য বাধ্য করার চেষ্টা করেন তাহলে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাব।
উত্তরঃ

ক) তুমি কিছু চিন্ত করো না। আমি তোমার মা-বাবার সঙ্গে কথা বলব যাতে তাঁরা আর তোমাকে এখনই বিয়ের ব্যাপারে জোর না করেন- এবং তোমাকে আরও লেখাপড়া করার সুযোগ দেন।

খ) তোমার মা-বাবা কি এখনই তোমার বিয়ে দিতে চান? তোমার নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

গ) তোমার যেহেতু মনে হচ্ছে তোমার মা-বাবা বড্ড বেশী কর্তৃত্বপরায়ণ, সেইজন্যই তোমার মন বিদ্রোহ করে উঠেছে। আর তাই তুমি বিয়ে করতে চাইছো না, আরও পড়াশুনা করতে চাইছ।

ঘ) মা-বাবার কথা শোনার জন্য তুমি যেমন একদিকে উদ্বিগ্ন বোধ করছো এবং তোমার মনে একটা অপরাধবোধ জাগছে, অন্যদিকে আবার তুমি সত্যিই এখনই বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত নও। তুমি বুঝতে পারছ না তোমার এখন কি করা উচিত।

ঙ) তোমার মা-বাবা যাকরছেন আসলে তা তোমার ভালর জন্যই করছেন। তোমার মতন লক্ষ্মী মেয়েরা বাবার কথাই শোনে, বাড়ী থেকে পালিয়ে যায় না।

৩। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র/ ছাত্রীর বক্তব্যঃ
আমার কি যে হচ্ছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি অন্য সকলের মতো যথেষ্ট পড়াশুনা করি, কিন্তু আমি কিছুতেই ভালো নম্বর পাই না। আমার সমস্ত চেষ্টাই জলে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি না আমি আর কি করব।
উত্তরঃ

ক) যে সমস্ত বিষয়ে অন্যদের চেয়ে তোমার বেশী যোগ্যতা আছে, সে সমস্ত বিষয়ে তুমি ভাবছো না।

খ) তোমার কি ধরনের পড়াশুনার অভ্যাস?

গ) আজকাল পাঠ্যসূচী সত্যিই বেশ কঠিন। কোন বিষয়গুলি তোমার কঠিন লাগে তুমি যদি আমাকে জানাও

তাহলে আমি তোমায় কিছুটা সাহায্য করার চেষ্টা করতে পারি।

ঘ) তুমি যতই চেষ্টা করোনা কেন, পূর্ন মনোযোগ যদি না দিতে পার তাহলে কোনদিনই তুমি কৃতকার্য হতে পারবে না।

ঙ) পড়াশুনার সঙ্গে তুমি ঠিকমতো তাল রেখে চলতে পারছো না বলে নিশ্চয়ই তুমি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন বোধ করছ। তুমি যে চেষ্টা করছ না তা কিন্তু নয়, আসলে তুমি তোমার পরিশ্রমের ঠিক মতন ফল পাচ্ছো না।

৪। জনৈক মায়ের বক্তব্যঃ

আমার মেয়ের ব্যাপারে আমার দারুন একটা হতাশা এবং রাগ হচ্ছে। ও খুবই বুদ্ধিমতি সুক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন, কিন্তু ওর চরিত্রের এমন কতোগুলো দিক আছে যার জন্য আমি এমন খিটখিটে আর উত্তেজিত হয়ে পড়েছি যে অনেক সময়ই নিজেকে ঠিক সামাল দিতে পারি না।

উত্তরঃ

ক) কম বয়সী মেয়েরা সাধারণত এরকমই হয়ে থাকে। তাদের ঠিক মত নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় এবং নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দিতে হয়।

খ) আমি নিজে মা হয়ে বুঝতে পারছি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে আচরণ করা কত শক্ত কাজ। কিছুদিন বাদে অবশ্য মেয়েরা খুবই লক্ষ্মী হয়ে যায়। তোমার এই যে অভিজ্ঞতা এটা নিতান্তই একটা সাময়িক ব্যাপারও হতে পারে।

গ) তোমার মেয়ের ব্যবহার হয়ত সত্যিই হতাশাজনক। আসলে তুমি হয়তো যা জানতে চাইছো তা হচ্ছে-কি করে আমি তাকে সাহায্য করতে পারি, নিজেকেই বা আমি কি করে সামাল দেব, বিশেষ করে মেয়ের সম্পর্কের ব্যাপারে ।

ঘ) তুমি কি কখনও তোমার মেয়ের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছ?

ঙ) হয়তো কলেজে গিয়ে তোমার মেয়ে কোন কুসংসর্গে পড়েছে। আর তার জন্যই তার ব্যবহারগুলো এ রকম হচ্ছে।

৫। জনৈক ছেলের বক্তব্যঃ

আমার থেকে কম বয়সী ছেলেদের আমার নিজের থেকে বেশী পুরুষোচিত মনে হয়। আর যারা আমার সমবয়সী, তাদের তো আরও বেশী পুরুষোচিত মনে হয়। আমি কেন ওদের মতো দেখতে না? কেন আমার মধ্যে পৌরুষের এত অভাব? এই কথা ভেবে আমার সারাক্ষণ হতাশ এবং বিব্রত লাগে। সাথে সাথে একটা মানসিক চাপও অনুভব করি।

উত্তরঃ

ক) মানসিক চাপ বলতে তুমি কি বুঝো?

খ) বসে বসে এটা নিয়ে দুঃখ করে কোন লাভ হবে না। এবার এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা কর।

গ) অন্য পুরুষ বা অল্প বয়সী ছেলেদের সাথে থাকতে তোমার খারাপ লাগে। বিব্রত বোধ কর। তাদের তুলনায় তোমার নিজের মধ্যে পৌরুষের অভাব বোধ কর। অথচ তোমার খুব ইচ্ছে করে তাদের মতো হতে

ঘ) পুরুষোচিত চেহারা না হলেও তোমার মধ্যে তো অন্য অনেক পুরুষোচিত গুন আছে।

ঙ) তুমি বরাবর ঘরের মধ্যে থাকতে ভালোবাস। বাইরে বেরিয়ে খেলাধূলা বা ব্যায়ামের অভ্যাস তোমার নেই। তাই অন্যান্য পুরুষদের মতন তোমার লম্বা-চওড়া শক্তিশালী চেহারা না। সেই জায়গায় তুমি রোগা ও ছোটখাট দেখতে বলে, তোমার ধারণা তুমি যথেষ্ট পুরুষোচিত না।

৬। জনৈক মায়ের বক্তব্যঃ
আমার ছেলে খুবই অসুস্থ। বাড়িতে এমন কেউ নেই যে তার দেখাশুনা করতে পারে। আমি অফিস থেকে ছুটি নিতে চাই, কিন্তু আমার সমস্ত ছুটি ফুরিয়ে গেছে। আমি এখন কি করি বলুন তো?
উত্তরঃ

ক) আসলে কোনটি তোমার প্রধান কর্তব্য-অফিস না তোমার ছেলের স্বাস্থ্য-তুমি এটা ঠিক করতে পারছ না মনে করছো।তোমার ছেলের স্বাস্থ্যের জন্য তুমি যেমন চিন্তিত তেমন তোমার চাকুরীর ব্যাপারেও তুমি উদ্বিগ্ন বোধ করছ।

খ) এইরকম সংকটময় মুহূর্তের জন্য তোমার ছুটি কিছুটা বাঁচিয়ে রাখা উচিত।

গ) তুমি কি তোমার উর্দ্ধতন অফিসারের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছ?

ঘ) তুমি এতটা চিন্তিত হচ্ছো কারন তুমি মনে করছ-তুমি ছাড়া তোমার ছেলের দেখাশোনা অন্য কেউ করতে পারবে না। আসলে অন্যেরা তোমারই মতো করে তোমার ছেলের দেখাশোনা করতে পারে এটা বোঝার চেষ্টা কর।

ঙ) আমি তোমার বসকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি, উনি সত্যিই অত্যন্ত ভদ্র এবং সহানুভূতিশীল মানুষ। তুমি যদি আলাদা তোমার সমস্যার কথা তাকে বল, আমার মনে হয় উনি নিশ্চয়ই তোমার ছুটির একটা ব্যবস্থা করে দিবেন।

উত্তরপত্র

(নীচে উত্তরগুরো দেওয়া আছে আপনার সংগে মিলিয়ে নিন)

নাম ঃ

নারী/পুরুষ ঃ

বয়স ঃ

পেশা ঃ

তারিখ ঃ

E/I/P/S/U										
১	ক	I	খ	P	গ	U	ঘ	E	ঙ	S
২	ক	S	খ	P	গ	I	ঘ	U	ঙ	E
৩	ক	I	খ	P	গ	S	ঘ	E	ঙ	U
৪	ক	E	খ	S	গ	U	ঘ	P	ঙ	I
৫	ক	P	খ	E	গ	U	ঘ	S	ঙ	I
৬	ক	U	খ	E	গ	P	ঘ	I	ঙ	S

অধিবেশণ-৯ ঃ সেবা গ্রহীতার সংগে সহমর্মিতা প্রকাশ করা

অধিবেশণের উদ্দেশ্য ঃ

১. সেবা প্রদানের সময় সহমর্মিতা কিভাবে দেখানো যেতে পারে এবং কেন তা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যাবে
২. যোগাযেগের ক্ষেত্রে সহমর্মিতা কিভাবে সহায়ক হয়ে থাকে সে সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পাবেন
৩. সেবা গ্রহীতার ইতিবাচক বা নেতিবাচক অনুভূতিগুলো বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে
৪. সহানুভূতি এবং সহমর্মিতার মধ্যকার পার্থক্য করতে শিখবেন

সহমর্মিতা (Basic Empathy)

সহমর্মিতা হচ্ছে অন্যের অভিজ্ঞতা, আচরণ এবং অনুভূতিকে তার মতো করে বুঝে তার সাথে কথা বলে। এই দক্ষতা সহায়তা করার প্রক্রিয়া সার্বক্ষনিকভাবে প্রয়োজন। কারণ ব্যক্তির সাথে ভাব বিনিময় করার জন্য তার মত করে তাকে বোঝা অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যেভাবে কোন একটা বিষয় দেখছে বা অনুভব করছে সেই আঙ্গিকেই বিষয়টিকে অনুভব করা প্রয়োজন। এটা ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপনে কিংবা সম্পর্ক উন্নয়নে খুবই সাহায্য করে।

সহমর্মিতা একটি বিশেষ গুণ যা একজন সেবা প্রদানকারীর থাকতে হয়। আমরা নিজের পূর্ব ধারণা থেকে বের হয়ে অন্য ব্যক্তির ধারণার জগতে প্রবেশ করে তা বোঝার চেষ্টা করতে পারি। যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সহমর্মিতা কিভাবে দেখানো যেতে পারে তা শেখানো যায়। তবে অনেক ব্যক্তি জন্মগতভাবেই সহমর্মিতা দেখানোর অধিকারী হয়ে থাকেন।

ব্যক্তির সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করতে হলে তার সঠিক আবেগ এবং তীব্রতার ধরণ বুঝে তার অনুভূতিটি প্রকাশ করতে হবে। নিচে কয়েকটা উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

- আপনি নিজের উপর বিরক্ত হচ্ছেন কারণ ওরা আপনাকে হুমকি দিচ্ছে কিন্তু আপনি করতে পারছেন না।
- আপনার অপরাধ বোধ হচ্ছে কারণ সে আপনার কাছে সরাসরি সাহায্য চেয়েছে কিন্তু আপনি কোন উত্তর দেন নি।

বেসিক এম্পেথি বা সহমর্মিতাকে ফলপ্রসূ করার জন্য সঠিক আবেগটিকে ধরতে হবে। সাহায্যকারীকে অত্যন্ত মনোযোগী হতে হবে।

সহমর্মিতাতে যে বিষয়গুলো ঘটে তাহলো ঃ

- অনুভূতির প্রতিফলণ ঃ একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সেবা গ্রহীতার যে অনুভূতিগুলো হয়েছিলো তা প্রতিফলিত করা হয়। যেমন, "আপনার রাগ লাগছিল", আপনার কষ্ট হচ্ছিল।
- বিষয়বস্তুর প্রতিফলণ ঃ একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সেবা গ্রহীতার যে অনুভূতিগুলো হয়েছিল তার সাথে যে বিষয়বস্তু বা ঘটনা জড়িত তার প্রতিফলণ করা হয়। যেমন- "আপনার রাগ লাগছিল কারণ আপনি

ভেবেছেন যে আপনাকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেয়া হয়নি","আপনার কষ্ট হচ্ছিল কারণ আপনার মনে হয়েছে মা আপনাকে যথেষ্ট ভালবাসেন না"।

- নির্বাচিত প্রতিফলণ ঃ সেবা গ্রহীতার প্রতিটি কথাই সমানুভূতির সাথে শুনা হয়, তবে প্রতিফলণ দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ আবেগের বক্তব্যকেই প্রতিফলিত করা হয়।
- সারসংক্ষেপ ঃ প্রতিটি সেশন শেষে সারসংক্ষেপ করার সময় সেবা গ্রহীতার বক্তব্যকে সমানুভূতি দিয়ে উপস্থাপন করা হয়।
- সক্রিয় শ্রবণ বা অ্যাক্টিভ লিসেনিং ঃ সক্রিয় শ্রবণ বা অ্যাক্টিভ লিসেনিং ও সহমর্মিতা দেখানোর জন্য জরুরী।

উপরের সব কিছুই সহমর্মিতা তৈরীতে সাহায্য করে। অর্থাৎ সহমর্মিতা প্রকাশে বাচনিক ও অবাচনিক উভয় যোগাযোগেরই প্রয়োগ হয়।

অনুভূতি এবং আবেগ বিভিন্নভাবে নির্দেশিত হতে পারে যেমন-

- আমি ভাল
- আমি হতাশ
- আমি অবহেলিত
- আমি আনন্দিত
- আমি বিরক্ত
- আমি বিষন্ন
- আমি বন্দি

বিভিন্ন প্রকারের বাক্যাংশ-

- আমি পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থানে বসে আছি
- আমার মনে হচ্ছে আমার পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে
- আমার মনে হচ্ছে আমি যেন জ্বলছি
- আমার মনে হচ্ছে আমাকে আবর্জনার মত ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে

একটা আচরণগত বক্তব্য দিয়ে প্রকাশ করা-

- আমার মনে হচ্ছে আমি আর পারছি না (অনুভূতি ঃ বিরক্ত)
- আমার মনে হচ্ছে আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরি (অনুভূতি ঃ আনন্দ)
- আমার মনে হচ্ছে তার দাঁত মুখ ভেঙ্গে দিই (অনুভূতি ঃ খুব রাগ)
- আমার মনে হচ্ছে আমার কষ্টের দিন শেষ এবং আমার নাচতে ইচ্ছা করে (অনুভূতি ঃ মুক্তি এবং আনন্দ)

অভিজ্ঞতার আলোকে কোন বহিঃপ্রকাশ করা-

- আমার মনে হচ্ছে আমি তার লিষ্টের সবচেয়ে ওপরে আছি (অনুভূতি ঃ আনন্দ)
- আমার মনে হচ্ছে আমার নি:শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে (অনুভূতি ঃ উদ্বেগ)
- আমার মনে হচ্ছে আমি কেমন একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছি (অনুভূতি ঃ হতাশা এবং বিরক্ত)

উপরের বক্তব্যগুলোর সাথে আবেগের প্রকাশ যোগ করে যেভাবে বলা যায় তার উদাহরণ হচ্ছেঃ

- আমার দারুন লাগছে কারন আমি বিশ্বাস করছি যে আমি তার লিষ্টের সবচেয়ে উপরে আছি
- আমি উদ্বিগ্ন কারন আমার মনে হচ্ছে যে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।
- আমি বিরক্ত হচ্ছি কারন আমি কেমন যেন একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছি।

<u>বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি এবং আবেগময় ঘটনা সম্বলিত কিছু পরিস্থিতি নীচে বর্ণিত হলো-</u>

"তুমি মনে করো যে তুমি এই ব্যক্তির সাথে কথা বলছ। লক্ষ্য কর অন্যের অনুভূতি বোঝার ও তা অন্যকে বোঝানোর জন্য চার ধরনের পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে"।

ঘটনাটি হচ্ছে একটা মেয়ে তার পছন্দের একটি চাকরি পেল।

একক শব্দঃ তুমি খুশী

একটি বাক্যাংশঃ তোমার মনে হচ্ছে তুমি আকাশে উড়ছো।

আচরণ সম্পর্কিত বক্তব্যঃ তোমার ইচ্ছে করছে বাইরে গিয়ে খবরটা সবাইকে জানাতে।

অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত বক্তব্যঃ তোমার মনে হচ্ছে, তোমার যা প্রাপ্য তাই তুমি পেয়েছো।

<u>কোনটি সহমর্মিতা নয়?</u>

সহমর্মিতার সাথে কতগুলো বিষয় খুব গুলিয়ে যায় ঃ

- সহানুভূতি দেখানো
- দিক নির্দেশনা বা সাজেশন দেওয়া
- বিচারক সুলভ মনোভাব
- অনুভূতিহীনতা বা এ্যাপাথি, অর্থাৎ ব্যক্তির মধ্যে অনুভূতির প্রকাশ থাকে না

<u>---এগুলো থাকলে তখন সহমর্মিতা দেখানো যায় না।</u>

<u>সহানুভূতি ও সহমর্মিতা</u>

সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। সহমর্মিতা হচ্ছে, অন্যের অভিজ্ঞতা, আচরণ, অনুভূতিকে তার মত করে বুঝে তার সাথে কথা বলা। সাহায্যপ্রার্থীকে তারমত করে বুঝাতে হবে, কারন একজন ব্যক্তি যেভাবে একটা বিষয় দেখছে বা অনুভব করছে সে আঙ্গিকেই বিষয়টি অনুভব করা প্রয়োজন। এটা সম্পর্ক স্থাপনে এবং উন্নয়নে খুবই সাহায্য করে।

আর অপরদিকে সহানুভূতি হচ্ছে নিজের উদাহরণ দিয়ে অন্যকে সান্ত্বনা দেয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তি অন্যের অনুভূতির উপর গুরুত্ব না দিয়ে কিংবা অন্যের অনুভূতিকে বোঝার চেষ্টা না করে নিজের অনুভুতিকে প্রকাশ করে থাকে এবং নিজের মত করে সমাধান দেয়ার চেষ্টাকরে। নীচে অনুভূতির একটি তালিকা দেওয়া হলো ঃ

ছক ঃ অনুভূতির তালিকা

অনুভূতির মাত্রা	সুখ	দুঃখ	রাগ	ভীতি/ভয়	সন্দেহ	শক্তিশালী	দূর্বল
নিম্নমাত্রা	সন্তুষ্টি	খারাপ	বিরক্ত	নার্ভাস	অস্বস্তি	শক্ত	একঘেয়েমি
	পরিতৃপ্তি	মূল্যহীন	মেজাজ গরম	অনিশ্চিত	অস্বাচ্ছন্দ্য	নিরাপদ	অনিশ্চিত
	খুশি	ছোট	আতংকিত	সাহসহীন	বিব্রত	নিশ্চিত	নড়বড়ে
মাঝামাঝি মাত্রা	প্রফুল্ল	কষ্ট	হতাশ	অস্বাছন্দ্য	এলোমেলো	সক্ষম	নিরাপত্তাহীন
	উদ্যমী/তৎপর	প্রচন্ড বেদনা	খিটখিটে	নিরাপত্তাহীন	জটিল	বিশ্বাসী	অসহায়
	আনন্দিত	যন্ত্রণা	উত্তেজিত/বিক্ষুব্ধ	খিটখিটে	উল্টাপাল্টা	আত্মবিশ্বাসী	অযোগ্য
উচ্চ মাত্রা	আনন্দে আত্মহারা	বিধ্বস্ত	ক্রুদ্ধ	ভয়	ঝামেলাপূর্ণ	সবল	দুর্বল
	প্রচন্ড উল্লসিত	বিষন্ন	উত্তেজিত	আতঙ্ক	ফাঁদে আটকানো	অতিরিক্ত শক্তিশালী	শক্তিহীন/অক্ষম
	উত্তেজিত	নিরাশ	ক্রোধোন্মুক্ত	ভীত	হতভম্ব/হতবুদ্ধি	ক্ষমতাবান	অসহায়

<u>সহমর্মিতা প্রদর্শনের সূত্র ঃ</u>

সহমর্মিতার সাধারন সূত্র হলো ঃ

অনুভূতি + কারণ = সহমর্মিতা

- "তোমার হতাশ লাগছে কারন তোমার মনে হচ্ছে তুমি কখনও পরীক্ষায় পাশ করবে না"
- "তোমার বেশ কষ্ট লাগছে কারন তুমি ভাবছো মা তোমাকে ভালবাসেন না"
- "তার তীব্র রাগ হয়েছে কারন সে ভেবেছে সে যথেষ্ট প্রাধান্য পায়নি"

<u>কিভাবে সেবা গ্রহীতার প্রতি সহমর্মিতা (Empathy) প্রকাশ করা যায় :</u>

- খুব মনোযোগ দিয়ে সেবা গ্রহীতার মৌখিক ও দৈহিক অভিব্যক্তিগুলো লক্ষ্য করতে হবে।
- সেবা গ্রহীতার অভিব্যক্তিগুলোর সাথে সঠিকভাবে পরিচিত হবার চেষ্টা করতে হবে।
- সেবা গ্রহীতার জন্য সহজে বোধগম্য হয় এধরনের ভাষায় তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।
- সেবা গ্রহীতার যে ধরনের অনুভূতি নিয়ে কথা বলছে সাহায্যকারীর গলার টোন সেধরনের হতে হবে।
- যতটা সম্ভব স্বতঃস্ফুর্তভাবে উত্তর দিতে হবে। অনেক সময় ধরে চুপ করে থাকাটা ঠিক নয়। সাহায্যকারী কি বুঝেছেন সেটা ব্যক্ত করে তারপর তিনি সেবা গ্রহীতার কাছ থেকে জেনে নেবেন তিনি তার কথা ঠিক মতো বুঝেছেন কিনা।
- দুজন দু'জনের কথা বুঝতে পারছে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে, তাতে করে সেবা গ্রহীতা আস্তে আস্তে তার অনুভূতির বিভিন্ন স্তরগুলো সাহায্যকারীর সামনে তুলে ধরবে।
- সেবা গ্রহীতা যে কথাগুলো বলতে পারছে না, সেগুলোর উপর মনোযোগ স্থাপন করতে হবে। তার কথাগুলোর মধ্যে যদি কিছু ফাঁক থাকে সেগুলো খুঁজে বের করে ফাঁকগুলো ভরে দেবার চেষ্টা করতে হবে।
- সাহায্যকারীর প্রতিক্রিয়াগুলো কতটুকু ফলপ্রসু হয়েছে সেটা সেবা গ্রহীতার আচরন এবং অভিব্যক্তি থেকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

নীচে উল্লেখিত অনুশীলনের মাধ্যমে আপনি ব্যক্তির অনুভূতি ধরে সহমর্মিতার সূত্র অনুযায়ী সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারবেন।

Exercise in Basic Empathy

নীচের ঘটনা গুলোতে দুটো ভিন্ন পদ্ধতিতে উপযুক্ত অনুভূতি এবং বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করতে হবে-

১. একজন ভদ্রমহিলার মেয়ে ডিগ্রী পাস করেছে, তিনি সেই উপলক্ষে কলেজের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছেন। তিনি চিন্তা ও করেননি তার মেয়ে পাস করতে পারবে। তিনি পরিশেষে বললেন "আমি সেখানে যাওয়ার জন্য ভীষনভাবে অপেক্ষা করে আছি"।

ক) .....(শুধু অনুভূতি)

খ) .....

.....(অনুভূতি ও কারন)

২. এক ভদ্রমহিলার ব্যাগ চুরি হলো। তিনি কিছুক্ষন আগে তার সাপ্তাহিক বেতন তুলেছেন এবং সেই টাকাটা তার হাত ব্যাগেই ছিলো। তিনি পরিশেষে বললেন যে, "আমার সমস্ত বিল পরিশোধ করতে হবে। আমি জানিনা আমি কি করবো।

গ) .....(শুধু অনুভূতি)

ঘ) .....

.....(অনুভূতি ও কারন)

৩. একজন ভদ্রলোক কিছু শারিরীক পরীক্ষা করতে দিয়েছেন এবং তার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছেন। গত দুইমাস ধরে তার ওজন কমে যাচ্ছে এবং তিনি সবসময় ক্লান্ত এবং অবসন্ন বোধ করেছেন। পরিশেষে তিনি বললেন "আমি মানে ..... মানে ঠিক বুঝতে পারছিনা আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। পরীক্ষা চলাকালিন সময়ে কেউই আমাকে কিছুই বলছে না"।

ঙ) .....(শুধু অনুভূতি)

চ) .....

.....(অনুভূতি ও কারন)

৪. একজন ভদ্রলোক একটি চাকরীদাতা প্রতিষ্ঠানে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়েছেন যার কি না একটা অপরাধের ইতিহাস আছে। তিনি আশা করেছিলেন যে তিনি চাকরিটা পাবেন এবং কেউ কিছু জানার আগেই তিনি এই কাজের জন্য নিজেকে যোগ্য করে তুলবেন। পরিশেষে তিনি বললেন "যে ব্যক্তি আমার সাক্ষাৎতকার নিচ্ছিলো তিনি যখন আমাকে বললেন যে তিনি আমার অপরাধের ইতিহাস জানেন তখন আমি আসলে বুঝতে পারছিলাম না যে আমি কি বলবো।

ছ) .....(শুধু অনুভূতি)

জ) .....

.....(অনুভূতি ও কারন)

৫. একজন ভদ্রমহিলা তার বাচ্চাকে পাওয়ার জন্য তার স্বামীর বিরুদ্ধে কেস করেছিলেন এবং হেরে গেছেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে কোর্ট তার বাচ্চাকে তার স্বামীর কাছে হস্তান্তর করবে বা রায় তার স্বামীর পক্ষে যাবে যাকে তিনি একজন স্বার্থপর এবং ক্ষতিকর ব্যক্তি হিসেবে জানেন। পরিশেষে তিনি বললেন "এখন সব শেষ।"

ঝ) .....(শুধু অনুভূতি)

ঞ) .....

.....(অনুভূতি ও কারন)

৬. একজন দম্পত্তির মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। তাদের বিবাহিত জীবন ছিলো এক বৎসরের তিনি চিন্তা করেছেন যে যা হয়েছে সেটা ভালো হয়েছে। তিনি তার হাঁটুতে মাথা রেখে পরিশেষে বললেন "এখন আমি কি করবো?"

ট) .....(শুধু অনুভূতি)

ঠ) .....

.....(অনুভূতি ও কারন)

অধিবেশণ-১০ ঃ সেবা প্রদানকারী হিসেবে নিজের যত্ন নেওয়া

অধিবেশণের উদ্দেশ্য ঃ

এই সেশন শেষে আপনি-

1. **সেবা প্রদানকারী হিসেবে নিজের যত্ন করা কেন জরুরী তা অনুধাবন করতে পারবেন**
2. **মানসিক চাপ সম্পর্কে জানবেন**
3. **কিছু এক্সারসাইজ সম্পর্কে জানবেন যা আপনাকে শান্ত বা রিলাক্স হতে সাহায্য করবে**

নিজের যত্ন ঃ

আমাদের দৈনন্দিন বিভিন্ন/ নানান ধরণের কাজ করতে হয়। (নারীদের জন্য) যেমনঃ (সকালে উঠে) বাড়ী-ঘড় ঝাড়ু দেয়া, রান্না-বান্না করা, সন্তাদের দেখাশোনা করা, জিনিসপত্র গোছানো, নামাজ-কালাম পড়া, চাকুরী করা ইত্যাদি কাজ করতে হয়। (পুরুষদের জন্য) যেমনঃ চাকুরী করা, নামাজ-কালাম পড়া, বাজার-সদাই করা, বাড়ী-ঘর দেখা শোনা করা ইত্যাদি কাজ করতে হয়। আর এইসব কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় আমরা আমাদের নিজের যত্ন নেওয়া বা পরিচর্যা করতে ভুলে যাই। বিশেষ করে- যখন আমাদের আবেগ, অনুভূতি, আচরণ, সামাজিক বন্ধন, পারস্পরিক সম্পর্ক, কাজের চাপ বা জীবন ধারণের প্রতিকূল পরিস্থিতি আমাদের মন ও শরীরের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে; তখন সেগুলো মোকাবেলা করতে না পারলে আমরা নিজেদের দিকে খেয়াল করতে ভুলে যাই। কখনো কখনো অস্থির হয়ে যাই কিংবা খারাপ/নেতিবাচক চিন্তা করতে শুরু করি।

এবার মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন-

"আপনার কি এমন কোন ঘটনা মনে পরে যেখানে কোন কারনে সময় মতো খাওয়া বা ঘুম বা গোসল হয়নি.....সময় অনুযায়ী যে ধরনের পরিচর্যা করা দরকার তা করা হয়নি, এমন যেকোন বিষয় হতে পারে। আপনি কি এ ধরণের কোনো ঘটনা সনাক্ত/মনে করতে পারেন?!"

এবার ভাবুন তো ঐ সময়ে,

"নিজের পরিচর্যা করার জন্য আপনি কী কী উপায় অবলম্বন করেছিলেন?

"ভেবে দেখুনতো, আমরা এসব কিছু করতে পারি কিনা- কঠিন ও প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে মানসিকভাবে ভাল থাকার জন্য?

- পরিবারের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা
- স্বামী বা স্ত্রীর সাথে ভালবাসা ও মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক থাকা
- প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলার জন্য সময় বের করা
- নিজের সন্তানদের সাথে সময় অতিবাহিত করা
- অন্যকে সাহায্য করা
- শারীরিক ব্যায়াম বা কায়িক পরিশ্রম এর সুযোগ থাকলে করা
- ধর্মীয় অনুশাসন পালন করা
- সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা এবং
- সর্বদা ভাল থাকার চেষ্টা করা"

একজন সেবাপ্রদানকারী হিসেবে অন্য আরেকজন ব্যক্তিকে সাহায্য করতে হলে, নিজেকে মানসিকভাবে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখা প্রয়োজন। তা না হলে, আরেকজন ভূক্তভোগীর মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো বোঝার মতো সামর্থ নাও হতে পারে।

আমাদের সবসময় নিজেদের পরিচর্যা করা এবং তা অনুশীলন করা প্রয়োজন। এটি আমাদের সাহায্য করবেঃ

- খারাপ, প্রতিকূল ও কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে
- শুধুমাত্র নেতিবাচক অভিজ্ঞতা এবং দিকগুলোর উপর মনোযোগ না দিয়ে বরং জীবনের ইতিবাচক ও সুন্দর সময়গুলোকে মনে করিয়ে দিতে
- পরিবেশ ও জগতের সাথে সংযোগ ও আশেপাশের মানুষের সাথে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে
- এমন ব্যক্তিদের চিনতে যারা আমাদের সাহায্য করতে পারে বা আমরা বিশ্বাস করতে পারি
- নিজেদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে কিভাবে ভাল থাকা যায় তা বুঝতে ও করতে

এবার জেনে নেই মানসিক চাপ এবং করনীয় সম্পর্কে ঃ

চাপ ঃ আমাদের শরীর ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা করতে গিয়ে যে টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে যায় তাকেই বলে স্ট্রেস বা চাপ। মন ও শরীর দুয়ের উপরেই এই চাপের প্রভাব পড়ে, যা কিনা ইতিবাচক বা নেতিবাচক উভয় ধরনের অনুভূতি উৎপন্ন করতে পারে। ইতিবাচক প্রভাব হলে আমাদের কাজে প্রবৃত্ত করে। যার ফলে আরও সচেতনতা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

লক্ষণঃ আমরা যখন চাপে থাকি তখন চাপ সংক্রান্ত অনেক চিহ্ন এবং লক্ষণ আমরা নিজেদের মধ্যে লক্ষ করতে পারি।'স্ট্রেস বা চাপ' এর লক্ষণ গুলি ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন হয় এবং নির্ভর করে মূলতঃ দু'টি বিষয়ের ওপর

১. চাপ সৃষ্টিকারী পরিস্থিতি কতটা তীব্র এবং তার স্থায়িত্ব কতটা।
২. যে ব্যাক্তি চাপ অনুভব করছে তার ব্যক্তিত্বের গঠন কিরকম।

চাপ-এর চিহ্ন এবং লক্ষণগুলি আমাদের অনুভূতি, চিন্তা,আচরণ এবং শারীরিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

অনুভূতি ঃ

আমরা যখন চাপ অনুভব করি তখন নিম্নলিখিত অনুভূতিগুলি উৎকণ্ঠা, ভীতি, বিরক্তি, খেয়ালীভাব, অসহায়তাবোধ,নৈরাশ্য, বিপদগ্রস্থ মনোভাব, আত্মরক্ষামূলক, দুঃক্ষ, অনাসক্তি।

চিন্তা ঃ

স্ট্রেস বা চাপের সময় যে চিন্তাগুলি প্রভাবশালী হয় সেগুলি হল -

- নিজের যোগ্যতা এবং ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ।
- কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে না পারা।
- ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা।
- বিভিন্ন ধরনের ভাবনা ও কাজ নিয়ে আবিষ্ট থাকা।
- ভুলে যাওয়া।
- ভাবনায় গতি হ্রাস পাওয়া।
- অতি দ্রুত নানা বিষয় চিন্তা করা।

আচরণ সংক্রান্ত লক্ষণ ঃ

শরীর বৃত্তীয় লক্ষণ ঃ

চাপ অনুভূতির সাথে কিছু আচরণগত পরিবর্তনও যুক্ত।

- কথা বলার সময় তোতলামি বা অন্য কোন রকম সমস্যা হওয়া।
- আপাতদৃষ্টিতে কোন কারন ছাড়াই সমানে কেঁদে যাওয়া।
- আবেগ তাড়িত আচরণ করা।
- সহজে চমকে ওঠা।
- উচ্চস্বরে হাসা
- গলার স্বরে স্নায়বিক দূর্বলতা প্রকাশ পাওয়া।
- দাঁত কিড়মিড় করা।
- অতিরিক্ত ধূমপান।
- অতিরিক্ত মদ বা মাদকদ্রব্য সেবন।
- দুর্ঘটনাগ্রস্থ হওয়া।
- যৌন আচরণে সমস্যা।
- ক্ষিদে কমে যাওয়া বা অতিরিক্ত খাওয়া।
- অধৈর্য ভাব।
- তাড়াতাড়ি বিতর্কে জড়িয়ে পড়া।
- পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে গুটিয়ে যাওয়া।
- ইচ্ছাপূর্বক কোন বিষয়ে বিলম্ব করা।
- একা একা থাকতে চাওয়া।
- দায়িত্ব পালনে অবহেলা।
- পেশাগত কাজের ক্ষেত্রে ভালোভাবে কাজ না করা।
- নিজের শরীর স্বাস্থ্যের সম্পর্কে মোটেই সজাগ না থাকা।
- শরীর এবং হাত ঘামা।
- হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া।
- কাঁপন।
- আচরনগত মুদ্রাদোষ।
- রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়া।
- মুখ,গলা শুকিয়ে যাওয়া।
- সহজে ক্লান্ত হওয়া।
- বারেবারে প্রসাব করা।
- ঘুমের সমস্যা।
- পেটের অসুখ বা কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়া।
- বমি হওয়া।
- পেট গুড়গুড় করা।
- মাথাধরা।
- মেয়েদের মাসিকের আগে দুঃশ্চিন্তা।
- গর্ভধারণের ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়া।
- ব্যথা

চাপ কোন কোন জায়গা থেকে সাধারণত আসে তা খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে যে আমাদের পরিবেশ বা পরিস্থিতি আমাদের ওপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি করে। এর মধ্যে পাশের পুজো প্যান্ডেলে উদ্দাম মাইক বাজানোর ফলে শব্দদূষণের চাপ রয়েছে, তেমনি কাজের জায়গায় স্বাধীনতা না থাকার বা সহকর্মীদের সহযোগিতা না পাবার চাপও থাকতে পারে। সমাজ ও নানাভাবে আমাদের ওপর চাপ দেয়। সমাজের কিছু নিজস্ব নিয়ম আছে, যেগুলো মেনে চলা মানিয়ে নেওয়ার জন্য ক্রমাগত আমাদের ওপর চাপ দেওয়া হয়। একজন মানুষের শরীর তার নিজের নিয়মে কখনো কখনো মনের ওপর চাপ ফেলে, যেমন বয়সন্ধির সময়, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বা প্রসবের পর, বার্ধক্যের সময় ইত্যাদি। একেকজনের চিন্তা ভাবনার মধ্যে চাপের উৎস লুকিয়ে থাকে। নিজেকে অতিরিক্ত বড় বা ছোট মনে করা, যে ঘটনার ওপর কোনো হাত নেই তা নিয়ে চিন্তা করা, নানারকম অবাস্তব চাহিদা থাকা, এসব থেকে মনের ওপর চাপ পড়ে খুব। অর্থাৎ নিজেকে ঠিকঠাক বুঝে নিতে না পারলে, যুক্তি দিয়ে পরিবেশ /পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে না পারলে সমাজের অহেতুক চাপের মুখে দৃঢ় হয়ে না দাঁড়াতে পারলে তারা আপনাকে অসুবিধায় ফেলার চেষ্টা করেই যাবে।

চাপের উৎস ঃ আমাদের চাপ মূলত চার ধরণের উৎস থেকে হতে পারে –

১. পরিবেশ

আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আমাদের কাছে সর্বদা মানিয়ে চলার দাবি করে। কিন্তু কখনও কখনও

২. সামাজিক কারণ

সামাজিক ক্ষেত্রে নিচের পরিস্থিতিগুলি আমাদের চাপের কারণ হতে পারে।

- সময় ও মনোনিবেশের দাবি।

বেঁচে থাকা অথবা অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়।

- ব্যক্তিগত জগতে সমস্যার অনুপ্রবেশ ঘটে।
- কাজের এবং বসবাসের জায়গা যথার্থ নয়।
- শব্দের তীব্রতা।
- নোংরা এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ।
- দূষণ।
- অগোছালো পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভিন্ন পরিমাণ চাপের সৃষ্টি হতে পারে।

৩. শারীরবৃত্তীয় উৎস

- বয়সন্ধিকালে দ্রুত বৃদ্ধি ও পরিবর্তন।
- মাসিকের আগের লক্ষণ /পরিবর্তনসমূহ।
- প্রসবের পরের পরিস্থিতি।
- মাসিক বন্ধের প্রক্রিয়া বা তার পরবর্তী জীবন।
- অসুস্থতা।
- বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

উপরের এই শারীরিক পরিবর্তন বা অবস্থাগুলি চাপের ক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয় উৎস হতে পারে। এছাড়াও যথাযথ
শরীরচর্চার অভাব, পুষ্টির অভাব, অতিরিক্ত কফিপান, চিনি বা নুন খাওয়া এবং অস্বাস্থ্যকর খাবারের অভ্যাসও- চাপের কারণ হতে পারে।

- কাজ করার সময়সীমা।
- আর্থিক সমস্যা।
- চাকরীর পরীক্ষা/ ইন্টারভিউ
- যথার্থ সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদন করার চাপ।
- মতবিরোধ।
- প্রিয়জনকে হারানো বা বিচ্ছেদ হওয়া।
- পরিবারের পরিবর্তন।
- সম্পর্কের ক্ষেত্রে চাহিদা সংঘাত।
- কাজের চাপ।

৪. চিন্তাধারা

কখনো কখনো ব্যক্তির অভ্যন্তরেই চাপের সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ জীবনের ঘটনা বা বিষয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই সে সম্বন্ধে অতিরিক্ত চিন্তা বা উৎকণ্ঠার থেকে বা জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তড়িঘড়ি করা - স্ট্রেস তৈরীর কারণ হতে পারে। উপরন্তু অতিরিক্ত খুঁতখুঁতে স্বভাব, নিজের চাহিদা বা ইচ্ছাকে ক্রমাগত অস্বীকার করা ফলাফল বা পরিনাম বিষয়ে অতিরঞ্জন- কোন ঘটনার নাটকীয় বর্ণনা ইত্যাদি প্রবণতা থেকেও ব্যক্তি চাপের শিকার হতে পারেন।

কোনো কিছু অর্জন করার ক্ষমতা ও সবসময় সমস্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার নিরীখে নিজের প্রতি অবাস্তব চাহিদা অন্যের কাছ থেকে সামগ্রিক এবং ধারাবাহিক সমর্থন, স্বীকৃতি, প্রশংসা ও নতিস্বীকার করা এসব অবাস্তব চাহিদাও চাপের সাধারণ কারণ।

নীচের তালিকাটির মাধ্যমে কাজের ক্ষেত্রে চাপ তৈরী করে এমন পরিস্থিতি গুলির উল্লেখ করা হলো

পেশাগত কাজই যেখানে চাপের উৎস; তার কতগুলি বিভাগ হতে পারে	উদাহরণ
১. মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট যা বিশেষ বিশেষ কাজের সঙ্গে যুক্ত উপাদান	● কাজের পরিমাণ (কাজের চাপ বেশি বা কম)। ● কাজের গতি, বৈচিত্র কাজ করার সার্থকতা। ● স্বাধীনতা (বিশেষ কোনো কাজের ব্যাপারে বা নিজের পেশা সংক্রান্ত বিষয়ে তোমার নিজের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা। ● প্রতিদিন কাজের মোট সময়/ দিনের কোন বিশেষ সময়ে কাজ করা। ● পারিপার্শ্বিক পরিবেশ- শব্দ, বায়ু দূষণ ইত্যাদি। ● একাকীত্ব- কর্মক্ষেত্রে একাকীত্ববোধ (মানসিক একাকীত্ববোধ বা কোনো কাজ একা একা করা)।
২. সংস্থাটিতে ব্যক্তির ভূমিকা	● কর্মক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়ে সংঘাত (পেশাগত কর্মক্ষেত্রে চাহিদার মধ্যে দ্বন্দ্ব/তত্ত্বাবধায়ক বা পরিচালকের সংখ্যা একাধিক)। ● নিজের ভূমিকা সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা ঃ দায়িত্ব, চাহিদা ইত্যাদির সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব। ● দায়িত্বের পর্যায় কোন স্তরের দায়িত্ব পালন করতে হয়।
৩. কর্মজীবনে উন্নতি	● যথেষ্ট উন্নতি না হওয়া বা যোগ্যতার তুলনায় বেশি অগ্রগতি। ● পেশাগত কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাবোধ (আর্থিক কারণে, কাজের সুযোগের অভাবে, দায়িত্বের ওভাবে ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা)। ● কর্মক্ষেত্রে ভবিষ্যতের উন্নতির সুযোগ আছে কিনা ● সামগ্রিকভাবে কর্মক্ষেত্রে পরিতৃপ্তি
৪. কর্মক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক	● সুপারভাইজার বা তত্ত্বাবধায়কদের স্তরে। ● সহকর্মীদের ক্ষেত্রে। ● অধীনস্থকর্মচারীদের ক্ষেত্রে ● হিংসা বা হেনেস্তা হওয়ার ভয় যেমন ঃ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বা অস্তিত্বের প্রশ্নে আসংঙ্খা
৫. সংস্থার সামগ্রিক পরিকাঠামো/ আবহাওয়া	● নীতিনির্ধারণে অংশগ্রহণের সুযোগ আছে বা নেই ● সংস্থার পরিচালন পদ্ধতি কিরকম

চাপের প্রভাব ঃ

চাপের ফলে তীব্র **শারীরিক সমস্যা** হতে পারে, যেগুলি হল – • উচ্চ রক্তচাপ • মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ • শ্বাসকষ্ট • হৃদযন্ত্রের সমস্যা • মানসিক বিকারজাত শারীরিক ব্যধি • রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি • হজমের সমস্যা • খাদ্যনালীর ঘা	**মানসিক স্বাস্থ্যের** ওপর চাপের প্রভাব নিম্নরূপ- • ডিপ্রেশন বা বিষাদ • প্যারানোইয়া সন্দেহ প্রবণতা (বদ্ধমূল ভ্রান্তধারণা বিশিষ্ট মানসিকতা) • অনিয়ন্ত্রিত রাগের বহিঃপ্রকাশ আত্যহত্যার প্রবণতা • নেশা করা
শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলা ছাড়াও আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। চাপের দ্বারা আমাদের অনুভূতি, খেয়ালিপনা, আচরন, চিন্তা ইত্যাদি প্রভাবিত হয় যা মূলত ঃ নেতিবাচক ।	

অতিরিক্ত চাপ আমাদের শরীর ও মনকে প্রভাবিত করে এবং স্বভাবতই আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলিতে এবং ব্যক্তির কর্মক্ষমতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একজন ব্যক্তি তার কর্ম ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় না। তার কাজের গুণগত মান ও পরিমাণগত মান ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই অবস্থা পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে, কাজের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা পুনরায় চাপ বৃদ্ধি করে। এইভাবে চক্রের আকারে চাপের বৃদ্ধি ঘটে থাকে ও ক্রমশঃ ব্যক্তি মানসিক ও শারীরিকভাবে চাপের মুখে ভেঙে পড়তে থাকে। চাপের প্রভাবে একজন ব্যাক্তি ক্রমে তার কর্মক্ষেত্রে ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়।

এ প্রসঙ্গে আরও বলা যেতে পারে যে, ক্রমাগত চাপের আঘাতে ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক দৃঢ়তা ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং মানসিক অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠতে থাকে। এই অবস্থা কাটিয়ে সুস্থ হবার জন্য একজন ব্যক্তির চিকিৎসা, কাউন্সেলিং এমনকি হাসপাতালে ভর্তি থাকা প্রয়োজন হয়। কারণ চিকিৎসার সাহায্যেই একমাত্র ঐ ব্যক্তি পূর্ণমাত্রায় সেরে উঠবে এবং পুনরায় তার সামাজিক ভূমিকা ও কার্যক্ষেত্রে তার সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম হয়ে উঠবে। নিজের সমস্ত সুপ্ত সৃজনশীল গুণাবলী সঠিকভাবে প্রকাশ করতে ও জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে জীবনকে উপভোগ করতে পারবে।কাজের ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত উদ্যম, শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে তার দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

চাপ ও তার মোকাবিলা

'স্ট্রেস অ্যাওয়ারনেস' চাপ সম্পর্কে সচেতন থাকার ডায়েরি ঃ

কোন কোন বিষয় বা পরিস্থিতি, ঘটনা বা অভিজ্ঞতা মনের ওপর চাপ তৈরি করে তার একটা তালিকা বানান যেখানে চারটি ক্ষেত্র ভাগ করে নিতে হবে - ব্যক্তিগত ক্ষেত্র, পারিবারিক ক্ষেত্র, আন্তসম্পর্কের ক্ষেত্র (আপনার সঙ্গে অন্য মানুষদের সম্পর্ক), আর কাজের ক্ষেত্র। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রকে আলাদা করে নিয়ে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোকে লিখুন। আবার এই লেখাটাকে চারটে ভাগ করুন। প্রথম ভাগে থাকবে চিন্তা, দ্বিতীয় ভাগে আবেগ/অনুভূতি তৃতীয় ভাগে আচরণ আর শেষভাগে শারীরিক লক্ষণ। অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে লিখতে হবে- চাপের ঘটনা- তার থেকে তৈরি হওয়া চিন্তা- তার ফলে তৈরি হওয়া আবেগ/অনুভূতি- তার প্রভাবে কি রকম আচরণ করেছেন- কোন শারীরিক লক্ষণ অনুভব করেছেন কিনা। এর সাথে যোগ করবেন এখন সেই ঘটনা আবার ঘটলে কি করতে চাইবেন। সব লেখা হয়ে গেলে প্রথমে আপনি দেখেছিলেন কোন ক্ষেত্রে আপনি সবথেকে বেশি চাপের পরিস্থিতি খুঁজে বার করতে পেরেছেন। তারপর চেষ্টা করুন ভাবতে, কোন কোন পরিস্থিতি বেশিরভাগ মানুষের জন্য চাপ তৈরি করছে, কোনগুলো আবার খুবই ব্যক্তিগত। কোন গুলোর সঙ্গে কি ধরনের চিন্তা- আবেগ- শারীরিক লক্ষণ এবং চাহিদা জড়িয়ে আছে, এগুলো খুটিয়ে দেখতে ও বুঝতে বলা হয়েছিল।

এই ডায়েরি আপনাকে অনেক দূর সাহায্য করতে পারে নিজের চাপের কারণ, ক্ষেত্র আর লক্ষণগুলোকে বুঝতে। একটা জিনিস এখান থেকে স্পষ্ট যে আমরা কেউ চিন্তা- আবেগ/অনুভূতি- আচরণ- শারীরিক লক্ষণ দিয়েই প্রকাশ করি। সে সময়ে কি চাই, অর্থাৎ চাপ যখন আসে তখন আমরা কি করতে চাই, তাও নির্ভর করে আমরা চাপটা কিভাবে বুঝেছি, ভাবছি, তার ওপরে। মোকাবেলা করতে পারব কি না বা পারলেও কতদূর সঠিকভাবে, সেটা নির্ভর করে কি চাই তার উপরে। যদি মোকাবেলা করতে চাই এবং বাস্তবসম্মত, যুক্তিনির্ভর হয় তবে চাপের মোকাবেলা করা যাবে অবশ্যই। এখানে একটা কথা মনে রাখবেন, চাপের মোকাবেলা করতে হলে নিজের মনের মধ্যে যা যা হচ্ছে সেগুলো পরিষ্কার বুঝে নেবার প্রয়োজন আছে।

নইলে যেটা চাইছেন সেই ধাপটায় পৌঁছাতে পারবেন না। বিশেষ করে আবেগ/অনুভূতির ধাপটাকে খুব ভালো করে দেখা দরকার। কারণ সচরাচর আমরা নিজেদের আবেগ-অনুভূতিকে জায়গা দিতে চাই না। কিন্তু আপনি যদি চিন্তা থেকে আবেগ-অনুভূতিতে পৌঁছাতে না পারেন তাহলে আচরনের বা শারীরিক লক্ষণের আসল কারণগুলো বুঝতেই পারবেন না। আবেগ গুলো ধরতে পারলে, সেগুলো নিয়ে ভাবতে পারলে, নিজে অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন হলে আপনি অনেক সহজে মনের কথা বলতে পারবেন, চাপের মোকাবিলা করতে পারবেন। মনের মধ্যে ভয় থাকলে আগে সেটা বুঝন, স্বীকার করুন যে হ্যাঁ, রাগ/ দুঃখ/ ভয় হতাশা হয়েছে, তবে তো তার মোকাবেলা করবেন। যদি ভাবতে থাকেন যে এই পরিস্থিতিতে ভয় পাওয়াটা কাপুরুষতার লক্ষণ, অতএব আমি মোটেই ভয় পাইনি, আমার আচরণ ভয় জনিতনয় আমার বুক ঢিপঢিপ করছেনা, হাঁটু কাঁপছে না হাত-পা ঘামছে না তাহলে তো গোড়ায় গলদ হয়ে যাবে, তাই না ?

একটা অসুবিধা অনেক সময় হয়, অনুভূতি টা বুঝতে পারলেও তার নাম জানেন না বলে বা সংজ্ঞা জানেন না বলে সেটা যে ঠিক কি, তা প্রকাশ করে বলতে পারেন না। এটা আপনার ক্ষেত্রে হতে পারে । চেষ্টা করবেন একটু সময়

দিয়ে ভাবতে,সঠিক অনুভূতির নামটা না জানলেও, কাছাকাছি অন্যকিছু দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারেন, বা বর্ণনা দিয়ে, যে ঠিক কি কি হচ্ছে মনের মধ্যে।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম ঃ

চাপ কমানোর একটা ব্যায়াম হচ্ছে- নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম। প্রথমে আপনি চোখ বুজে নিঃশ্বাস নিন, এরপর এক হাত পেটের ওপর আর এক হাত বুকের ওপর রেখে অনুভব করে দেখুন কোথা থেকে নিঃশ্বাস /প্রশ্বাসের ধারা বইছে, পেট থেকে না বুক থেকে। চাপ কমানোর জন্য গভীর নিঃশ্বাস/প্রশ্বাসের প্রয়োজন হয় যা আসার কথা পেটের গভীর থেকে, বুক থেকে নয়। চেষ্টা করুন যাতে গভীর নিঃশ্বাস পেট থেকে উঠে আসে ধীরে ধীরে, তাতে আপনার মন শান্ত হয়ে যাবে, চাপের বোধ কমতে থাকবে।

'মূল চাপের কেন্দ্র'-খুঁজে বের করা ঃ

'মূল চাপের কেন্দ্র' হিসাবে আপনি যা খুঁজে পেয়েছেন সেখানকার কোন একটা ঘটনা /পরিস্থিতির কথা লিখুন। তারপর চিন্তা- আবেগ/অনুভূতি- আচরণ- শারীরিক লক্ষণ- চাহিদা এসবের বিশ্লেষণ করুন। তারপর লিখুন, সেই ঘটনা /পরিস্থিতির মোকাবিলা কীভাবে করেছিলেন বা করেননি। আর এরপর, আজকের জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি ভেবে দেখুন যে, আর কোন কোন পদ্ধতিতে আপনি ঐ চাপের অবস্থার মোকাবিলা করতে পারতেন।

এই একইভাবে 'কম চাপের ক্ষেত্র' বেছে নিয়ে একইভাবে লিখুন। ডায়েরির এই দুটি অংশকে পাশাপাশি রাখলেই দেখা যাবে যে কোন পরিস্থিতিতে আপনার যুক্তি, বুদ্ধি, চিন্তা, আবেগ একেবারে মুখ থুবরে পড়েছে এবং কেনই বা কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলো ঠিকঠাক কাজ করছে। আপনি এইভাবে চাপ মোকাবিলার জন্য আপনার মনের মধ্যে যে শক্তি আছে সেগুলো চিনে নিতে পারেন, যে দুর্বলতা আছে সেগুলোকেও বুঝে নিতে পারেনে।

সবথেকে চাপের জায়গা	অভিজ্ঞতা আবেগ আচরণ শারীরিক প্রতিক্রিয়া চাহিদা	মোকাবিলা করার ব্যবহৃত পদ্ধতি	বিকল্প পদ্ধতি কি কি হতে পারে

শরীরের চাপ খোঁজা ঃ

এরপরের এক্সারসাইজ হলো, শরীরের চাপ খোঁজা। চোখ বন্ধ করে বসুন এবং খুব আস্তে আস্তে এক এক করে নিজের শরীরের এক একটা অংশ অনুভব করে দেখুন যে, কোথায় কোথায় চাপ বোধ হচ্ছে। যেখানে চাপ খুঁজে পাবেন সেই জায়গাটিকে প্রথমে আরো চাপ দিন যাতে আপনি নিজে চাপটা ভালোভাবেই অনুভব করতে পারেন। শরীরের ওপর নিজেই চাপ দিয়ে দেখুন, আর সেইসঙ্গে মনে মনে বলুন যে- আমি নিজের শরীরের 'এই' অংশের উপর চাপ দিচ্ছি, নিজেকে কষ্ট দিচ্ছি। মনের ওপর চাপ পড়লে শরীরের যেমন তার প্রতিফলন হয়, তেমনি শরীরের কোন অংশে চাপ থাকলে, যা কিনা কোথা থেকে কেন তৈরি হয়েছে তা আমরা জানিই না হয়তো, মনের ওপর উল্টো চাপ তৈরি করতে পারে। তাই মাঝে মাঝে শরীরের নানান অংশের চাপ সম্পর্কে নিজেকে সচেতন করা দরকার, শরীরকে চাপমুক্ত করা দরকার।

শিথিলায়ন ঃ

" আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে, কঠিন পরিস্থিতিকে সামলে উঠার জন্য নিজের পরিচর্যার প্রয়োজন রয়েছে, এবং এটি আমাদের মনোসামাজিক ভাবে ভাল থাকার জন্য খুবই প্রয়োজন। এর মধ্যে আমরা কিছু উপায়ও চিহ্নিত করেছি, যেগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিকে সর্বোচ্চ কাজে লাগিয়ে ভাল থাকতে পারি। আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে, কঠিন পরিস্থিতিতে এগুলো মনে রাখাটাও খুব সহজ নয়।"

" আমরা এবার নিজের পরিচর্যার একটি পদ্ধতি হিসেবে শিথিলকরণের একটি পদ্ধতি অনুশিলন করবঃ

- একটু জায়গা নিয়ে হেলান দিয়ে বসি এবং
- আসুন আমরা শ্বাসগ্রহণ থেকে শুরু করি, নাক দিয়ে শ্বাসগ্রহণকরব এবং ধীরে ধীরে মুখ বা নাক দিয়ে শ্বাসত্যাগ করি।
- লম্বা শ্বাসগ্রহণ করি (স্বল্প বিরতি), ধীরে ধীরে শ্বাসত্যাগ করি...
- এভাবে কয়েকবার শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ করি (স্বল্প বিরতি)
- আমাদের শরীর শান্ত ও শিথিল না হওয়া পর্যন্ত এটি করি...
- শ্বাসগ্রহণ ও ধীরে ধীরে শ্বাসত্যাগ করি... (স্বল্প বিরতি)
- আমরা এবার অনেক শান্ত অনুভব করছি, এখন আমরা ধীরে ধীরে আমাদের চোখ বন্ধ করব তবে কোন অস্বস্তি লাগলে চোখ খোলা রেখে কোন একটি নির্দিষ্ট বস্তুর দিকে তাকিয়ে থাকবো
- এবার কল্পনা করি, আমার পায়ের পাতার চারপাশে সবুজ ঘাস... (বিরতি)
- খুব নরম ও সুন্দর ঘাস (স্বল্প বিরতি),ঘাসগুলো ঠিক আমার পছন্দের রংয়ের...চাইলেপছন্দের রং করতেও পারি (লম্বা বিরতি)
- এবং এটি খুব নরম ও কোমল, সুন্দর ও আরামদায়ক (বিরতি)
- আমার পায়ের পাতায় এটি আরামের অনুভূতি দিচ্ছে... (স্বল্প বিরতি)
- ধীরে ধীরে আরামের অনুভূতি পায়ের পেশীর উঠে আসছে...পেশিকে আরাম দিচ্ছে (স্বল্প বিরতি)
- এবার এটি হাটুর কাছে উঠে আসছে... (বিরতি)
- এরপর নিতম্বের কাছে... (স্বল্প বিরতি)
- এরপর কোমরের কাছে... (স্বল্প বিরতি)
- এবং আমাদের অনেক আরাম লাগছে... (লম্বা বিরতি)
- এবার এই আরামের অনুভূতি হাত ও বাহু দিয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠছে... (স্বল্প বিরতি)
- ধীরে ধীরে কাধ ও গলা স্পর্শ করছে... (স্বল্প বিরতি)
- এবং আমরা ধীরে ধীরে শ্বাসগ্রহণ করছি... (স্বল্প বিরতি) আমরা ধীরে ধীরে শ্বাসত্যাগ করছি ...(স্বল্প বিরতি)
- এবং আমাদের অনেক আরাম ও শান্তি লাগছে... (লম্বা বিরতি)
- এবার এই আরামদায়ক অনুভূতি আমার মুখমণ্ডলকে স্পর্শ করে উপরে উঠছে... (স্বল্প বিরতি)
- এখন আমাদের সম্পুর্ন শরীর আরামের অনুভূতির মাঝে...শুধুমাত্র নাক ও মুখ ব্যতিত, যা দিয়ে আমরা লম্বা শ্বাসগ্রহণ করছি ও ধীরে ধীরে শ্বাসত্যাগ করছি ... (স্বল্প বিরতি)
- এবং আমাদের অনেক আরামলাগছে... (লম্বা বিরতি)
- এবং আমাদের অনেক শান্তি লাগছে... (লম্বা বিরতি)
- আমরা লম্বা শ্বাসগ্রহণ করছি ও ধীরে ধীরে শ্বাসত্যাগ করছি ... (লম্বা বিরতি)
- এবার ঘাসগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে ... (বিরতি)
- তবে এখনও আমাদের অনেক আরাম লাগছে... (লম্বা বিরতি)
- এবং আমাদের অনেক শান্তি লাগছে... (লম্বা বিরতি)
- এবার আমরা ৫ বার লম্বা শ্বাসগ্রহণ করব... (স্বল্প বিরতি)

- ৫ লম্বা শ্বাস নিই... ধীরে ধীরে ছাড়ি... (স্বল্প বিরতি)
- ৪ লম্বা শ্বাস নিই... ধীরে ধীরে ছাড়ি... (স্বল্প বিরতি)
- ৩ লম্বা শ্বাস নিই... ধীরে ধীরে ছাড়ি... (স্বল্প বিরতি)
- ২ লম্বা শ্বাস নিই... ধীরে ধীরে ছাড়ি... (স্বল্প বিরতি)
- ১ লম্বা শ্বাস নিই... ধীরে ধীরে ছাড়ি... (স্বল্প বিরতি)

এবং যখন প্রস্তুত হব খুব ধীরে চোখ খুলব

"আমরা জানলাম যে- কঠিন পরিস্থিতিকে সামলে উঠার জন্য নিজের পরিচর্যার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা আজকে যা যা করলাম বা শিখলাম তা আরেকবার মনে করার চেষ্টা করি। এখন আমরা সবাই আমাদের চোখ বন্ধ করব। আমরা দুই মিনিট চোখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে নিশ্বাস নিব। আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আজ যা কিছু শিখলাম- তা একে একে ভাববো। আপনি চোখ বন্ধ রেখে চিন্তা করবেন এবং ভাববেন। এখন চোখ আস্তে আস্তে বন্ধ করুন এবং মনে করার চেষ্টা করুন কী কী শিখেছেন।"

অধিবেশণ-১১ ঃ একটি সংকটকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা করা

অধিবেশণের উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশণ শেষে আপনি -

১. ধারণা পাবেন বা বুঝতে পারবেন, হঠাৎ কোন সংকটকালীন পরিস্থিতিতে কিভাবে নিজে এবং অন্যনারা টিকে থাকি এবং তার সম্ভাব্য উপায়গুলো কি কি
২. এ ধারণার মাধ্যমে, সংকটে আছেন এমন ব্যক্তির মানসিক অবস্থা বুঝতে কিছুটা সমর্থ হবেন।

সঙ্কটকালীন পরিস্থিতি ঃ

প্রতিটি মানুষ জীবনে কিছু সঙ্কটকালীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে থাকেন এবং এটাই স্বাভাবিক। যেমন- কোন দূর্ঘটনা, দূর্যোগ, সম্পর্কে জটিলতা, সহিংসতার শিকার ইত্যাদি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, সঙ্কটকালে মানুষের যে যে প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে তা স্বাভাবিক, কেননা এরকম অস্বাভাবিক পরিপ্রেক্ষিতে এমন হতেই পারে। কার্যকরীভাবে সঙ্কটকালীন পরিস্থিতিতে সাহায্য করতে গেলে এমন তথ্য, কার্যকলাপ ও পরিকাঠামো দেওয়া দরকার যাতে সঙ্কট অতিক্রম করে মানুষ আবার তার আগের মানসিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারে।

সঙ্কটকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মূল কথা হলো সঙ্কটের মুখোমুখি হতে পারা। বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে সংকটকালীন পরিস্থিতিতে সহায়তা করতে গিয়ে তা যেন মানুষটির সমস্যাকে দীর্ঘায়িত না করে এবং মানুষটির নিজের ও আশেপাশের অন্যমানুষের জীবনে আরো সমস্যা ডেকে না আনে। পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া ও আলোচনা করা সঙ্কটকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলার অন্যতম উপায়।

আপনার বোঝার জন্য, সঙ্কটকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলার ৮ টি প্রয়োজনীয় উপাদান নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. শিক্ষা- বেশিরভাগ মানুষেরই সঙ্কটকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে বেরিয়ে আসতে পারার একটা সহজাত ক্ষমতা থাকে। তবে এর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সহায়তা, নির্দেশনা ও বিভিন্ন উপায় থাকাও দরকার।

খ. পর্যবেক্ষণ ও সচেতনতা-সঙ্কট নানা কারণে আসতে পারে, যেমন-আত্মসচেতনতার অভাব, নিজের বা অন্যদের উপর নিজের ব্যবহারের প্রভাব। সচেতন থাকলে অনেক উপায় খুঁজে পাওয়া যায়। ফলে আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হতে পারে ও ভালো থাকা সম্ভব হয়। সমস্যার দিকে না তাকালে এবং সমস্যার/নিজের দায় সম্পর্কে সচেতন না হলে সমস্যার মোকাবেলা করা যায় না। কিছু ক্ষেত্রে, পরিবারের নিজস্ব গঠনগত ও ভাবের আদান প্রদানগত সমস্যা সঙ্কটকে দীর্ঘায়িত করে।

গ. নিজের শক্ত ক্ষমতার প্রকাশ ও ব্যবহার- প্রতিটি সঙ্কটকালীন পরিস্থিতি ব্যক্তিগত বিকাশের সম্ভাবনা তৈরি করে এবং ব্যক্তির মধ্যে সর্বোচ্চ সুপ্ত সম্ভাবনার প্রকাশ করে। সঙ্কটকালীন পরিস্থিতিতে যে নিজেকে খুব সাহসী বলে মনে করে সেই সফল মানুষ হবে এমন নয়, বরং জীবনে অপরিহার্য এবং দুঃখজনক ঘটনার মুখোমুখি হয়ে নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা গুণ ও যোগ্যতার প্রকাশ যে করতে পাওে, সেই প্রকৃত ভাবে সঙ্কট অতিক্রমকারী সফল মানুষ।

যদিও সহায়তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সংকটের মধ্যে থাকা মানুষটিকে সুযোগ দেওয়া হবে না বা উৎসাহিত করা হবে না বা তার নিজের জীবনের সঙ্কট মোকাবিলা বা গুণগত মান উন্নয়নে তাকে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হবে না।

ঘ. নিজের সমস্যা বোধগম্য হওয়া- প্রত্যেক মানুষেরই মূল লক্ষ্য থাকে সঙ্কটকালীন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উপায় ও যোগ্যতার সর্বোত্তম ব্যবহার করা। যে কোনো সঙ্কটকালে প্রকৃত ও মনের গুরুত্বপূর্ণ ইচ্ছা বা অভিপ্রায়কে চিহ্নিত করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই অভিপ্রায়টা মনে রাখা খুব দরকার। আপনি কি করছেন বা কতটা দক্ষতার সাথে করছেন, সেটা বড় কথা নয়। যদিও সাধারণত আমাদের অভিপ্রায় থাকে জীবনকে আরো সুন্দর করে তোলা, কখনও কখনও আমাদের ব্যবহার ভুল পথে চালিত হতে পারে, লোকে ভুল বুঝতে পারে বা যতটা আমরা আশা করছি ততটা কার্যকারী নাও হতে পারে। নিজেকে বোঝা এবং অন্যরা আমাদের কিভাবে দেখে, তার মধ্যে নিজেকে পুনরুদ্ধারের গুরুত্বপূর্ণ চাবি লুকিয়ে থাকে।

ঙ. প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করা- সঙ্কটকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা ও সহায়তার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, একটা সামাজিক পরিবেশে'র ব্যবস্থা করা যেখানে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, অনুসন্ধান করতে পারে এবং সক্রিয় হয়ে ওঠে যাতে সঙ্কট আরো দীর্ঘায়িত না হয়। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে চরম বেদনার দিনেও কার্যকলাপ ও দৈনন্দিন কার্যাবলী করে থাকি যা আমাদের আরাম ও সহায়তা দেয়। এর মধ্যে মদ, ঔষধ বা অন্যান্য নেশাদ্রব্য থাকে না। কেবলমাত্র শারীরিক বা মানসিক বিপর্যয়ের সময় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

চ. অযৌক্তিক বিশ্বাস এবং অবাস্তব প্রত্যাশাকে আঘাতকরা- কিছু মানুষের সঙ্কটকালে এমন প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকে যাতে তারা নিজেদের চিন্তাভাবনা, কল্পনা, নিজের বা অন্যদের থেকে প্রত্যাশা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারে। কিন্তু আমাদের অনেকেই নিজেদের চিন্তা- ভাবনা, যেগুলোর দিকে আমরা লক্ষই করি না, তা আমাদের অনুভূতি ও পরবর্তী প্রতিক্রিয়া উপর অনেকাংশে প্রভাব ফেলে।

ছ. দুষ্ট চক্র ও আসক্তির অভ্যাসকে নষ্ট করা-বেশিরভাগ সঙ্কটকালীন সময়ে কিছু দুষ্ট চক্র ও আসক্তি থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, নেশা ও মাদক দ্রব্যাদির ব্যবহার শুধুমাত্র আমাদের জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় না এটা আমাদের নিজেদের, অন্যদের বা আশপাশের পৃথিবী সম্পর্কেও আমাদের মনে অনুভূতি ধোঁয়াশা তৈরি করে। যখন অনুভূতিগুলো রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ পত্র, মাদকদ্রব্য, ও অন্যান্য নেশাদ্রব্য দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন মানুষ নিজেদের অনুভূতি বুঝে উঠতে পারে না। খুব যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। মানসিক যন্ত্রণা থেকে অস্বাস্থ্যকর ভাবে পালিয়ে বাঁচার জন্য মানুষ নানা কাজ করে, যেমন- ঔষধ খায়, নেশাদ্রব্যে, মদে, যৌন সংযোগে আসক্ত হয়, রোমাঞ্চকর কাজ কর্মে লিপ্ত হয়, পার্টিতে যায় বা অত্যধিক কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করে।

নিজেকে প্রবঞ্চিতের ভূমিকায় দাঁড় করালে অন্যরা একজন সংকটে থাকা মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সঙ্কটের মোকাবেলা না করে সঙ্কটকে দীর্ঘায়িত করলে কিছু সহানুভূতিশীল সম্পর্ক তৈরি হয়। যখন কোন মানুষ অন্যদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে ও ভালো অনুভূতির দিকে যাওয়া এড়িয়ে চলে, তখন একটা দুষ্ট চক্র তৈরি হয়। দুষ্ট চক্র তৈরি হয় এমন ব্যবহার, মানসিক যন্ত্রণা এড়াতে সাহায্য করে, কিন্তু পরিণামে এগুলো যে সমস্যা এড়াতে চাইছি সেই একই সমস্যা বা আরো সমস্যা ডেকে আনে, দুষ্ট চক্রের মধ্যে যে ব্যবহার দেখা যায় বাস্তবে তা সঙ্কটকে দীর্ঘায়িত করে।

সাময়িক নির্ভরশীলতা তৈরি করে- সঙ্কটকালে, কখনও কখনও অন্যদের সাথে স্বল্পকালীন সম্পর্ক সহায়ক হয়। সঙ্কটকালীন মোকাবেলা ও সাহায্য খুবই উপকারী ও প্রয়োজনীয়। সুস্থ নির্ভরশীলতার সম্পর্ক সাধারণত সাময়িক হয় এবং সর্বদাই স্বাবলম্বীতার দিকে নিয়ে যায়। অস্বাস্থ্যকর নির্ভরশীলতা দীর্ঘকাল চলতে থাকে এবং স্বাবলম্বীতার পরিবর্তে নির্ভরশীলতাকে প্রশ্রয় দেয়।

ভয় নামক মানসিক যন্ত্রণার মুখোমুখি হওয়া- সংকটকাল বলতে সাধারনত আমরা ভয় বা দুঃখের সময়কে বুঝি আমরা কিভাবে প্রতিক্রিয়া করি তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভয় বা দুঃখ তৈরী হয়ে থাকে। যখন আমরা আমাদের জীবনে অন্ধকার দিনের মুখোমুখি হই, তখন আমরা ভয় বা দুঃখের দ্বারা ভেঙ্গে পড়ি না, বরং আবিষ্কার করি যে আমরা বাঁচতে পারি। সময়ের সাথে সাথে আমরা অনুভব করি যে আমাদের যন্ত্রণা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। মানসিক যন্ত্রণায় মুখোমুখি হওয়া সবচেয়ে সুস্থ প্রতিক্রিয়া। তার মানে এই নয় যে আমরা আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবো। কিন্তু চিন্তা ও অনুভূতিগুলি এড়িনোর কাজে নিজেদের লিপ্ত করে অহেতুক আমাদের শক্তি ক্ষয় করবো না। যখন মানুষ যন্ত্রণা ভোগ করে, তখন সে যাতে নিজেকে একা না ভাবে তার জন্য তাকে সাহায্য করা দরকার। মানুষের জীবনের সমস্যার সমাধানের জন্য তাকে সাহায্য করা প্রয়োজন। মানসিক যন্ত্রণার সময় মানুষকে সহায়তা করা ও শক্তিমান করে তোলা দরকার।

আশাকরি উপরের দেওয়া তথ্যগুলো আপনি পড়েছেন এবং সেগুলো ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারবেন।

অধিবেশণ-১২ ঃ কেন, কখন, কোথায় এবং কিভাবে রেফার করতে হবে

অধিবেশণের উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশণ শেষে আপনি -

৩. বুঝতে পারবেন সম্ভাব্য কোন কোন জায়গায় এবং পেশাজীবীদের নিকট মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভূগছেন এমন ব্যক্তিদের রেফার করতে পারবেন।

৪. এর সাথে সাথে, উল্লেখিত তালিকা ছাড়াও অন্য আর কোন রেফার করার জায়গা বা ব্যক্তি থাকলে সে তথ্য জানতে আগ্রহী হবেন।

কেন রেফার করবেন

আপনি এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জেনেছেন যে, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার প্রধান দু'টি ধরন ঃ

১. স্বল্প মাত্রার বা সাধারন মাত্রার মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং

 # কি করা যেতে পারে ঃ প্রথম ধরণের ক্ষেত্রে একজন কাউন্সেলর বা প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা কর্মীরাই তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দিয়েই ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারবেন। তাই আপনাকে জানতে হবে, এই পেশার মানুষগুলো নিকটস্থ কোথায় কাজ করছেন এবং তাদের সংগে যোগাযোগের উপায়। সেবা প্রদানের প্রয়োজনে এবং সাহায্যপ্রার্থীর সেবা নিশ্চিত করতে, আপনি বা আপনার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি তালিকা করে রাখতে পারেন এবং সময়ের সাথে সাথে তা আপডেট করতে পারেন। এতে আপনি এবং ঐ এলাকায় বসবাসরত ভূক্তভোগীরা উপকৃত হবেন।

২. তীব্র বা জটিল মাত্রার সমস্যা।

 # কি করা যেতে পারে ঃ তবে দ্বিতীয় ধরনের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন এবং জটিল হওয়ায় ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানী বা মনোচিকিৎসকের কাছে রেফার করা প্রয়োজন হয়।

ব্যক্তির মাঝে যে ধরনের আচরন বা আবেগীয় সমস্যা দেখা দিলে রেফার করতে হবে তা হলো ঃ

- কোন কারণ ছাড়াই শারীরিক কোন ক্ষমতা হ্রাস যেমন চোখে কোন সমস্যা ছাড়াই কোন কিছু না দেখতে পাওয়া হাত পায়ে প্যারালাইসিস (অবশ) হয়ে যাওয়া, কথা বলা বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।
- প্রতিদিনের যে কাজকর্মগুলো করার কথা সেগুলো না করতে পারা/অক্ষম(শিশুর বা নিজের যত্ন নিতে অক্ষম; নিজের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরনে অক্ষম)
- বেশি বেশি/ অস্বাভাবিক আচরণ করা/ মনেরভাব এবং আবেগ প্রকাশজনিত সমস্যা এবং অনেক বেশি শারীরিক কষ্টের কথা বলা, যার প্রকৃত শারীরিক কারণ কম থাকে
- মরতে(আত্মহত্যা) চাওয়া, নিজের বা অন্যের ক্ষতি করা
- পরিবারের সদস্যা বা প্রতিবেশী বা বন্ধুরা তাকে নিয়ে চিন্তিত থাকা

- পরিবারের সদস্যা/ প্রতিবেশি বা সমবয়শি সহ অন্য কারো দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা/ ঝুঁকিতে থাকা
- গায়েবি কথা শুনতে পাওয়া, অদৃশ্য কিছু দেখতে পাওয়া, জিন/ ভূতের আছরের অনুভূতি
- মাদকদ্রব্য গ্রহনের কোন লক্ষণ পাওয়া, মাংসপেশিতে খিঁচুনি/কাপুনী
- সহিংসতার শিকার নারী বা পুরুষ

কোথায় রেফার করবেন ঃ

- যেখানে সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্ট বা সাইকিয়াট্রিস্ট রয়েছেন। যেমন ঃ
    ১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি, শাহবাগ, ঢাকা
    ২. জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট,শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
    ৩. পাবনা মানসিক হাসপাতাল, পাবনা
    ৪. যে কোন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
    ৫. শহরের সরকারী হাসপাতাল
    ৬. ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতাল এবং ক্লিনিক যেমন- ল্যাব এইড, স্কয়ার, ইউনাইটেড, গ্রীন লাইফ, মনন, প্রত্যয়, সাইকিয়াট্রিক কিওর অন্যান্য
- যেখানে মনোবৈজ্ঞানিক বা সাইকোথেরাপী প্রদান করা। যেমন ঃ
    ১. ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
    ২. নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপী ইউনিট, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ৪র্থ তলা, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
    ৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি, শাহবাগ, ঢাকা
    ৪. জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট,শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
    ৫. শিশু বিকাশ কেন্দ্র, ঢাকা শিশু হাসপাতাল
    ৬. শিশু বিকাশ কেন্দ্র, জেলা পর্যায়ের সরকারী মেডিক্যাল কলেজ
    ৭. ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল
    ৮. ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল,১৯০/১, বড় মগবাজার রেলগেট, ঢাকা।
    ৯. ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতাল এবং ক্লিনিক যেমন- ল্যাব এইড, স্কয়ার, ইউনাইটেড, এ্যাপোলো, মনন, প্রত্যয়, সিএমএইচসিবি বাংলাদেশ, মনের বন্ধু, সাইকিয়াট্রিক কিওর অন্যান্য
- বিশেষায়িত সেন্টার ঃ
    ১. মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র। যেমন ঃ তেজগাঁও সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র; ক্রিয়া, মোহাম্মাদপুর; প্রত্যয়, বারিধারা; এবং অন্যান্য আরোও সেন্টার রয়েছে
    ২. এইচ আই ভি টেস্টিং এবং কাউন্সেলিং ঃ জাগরী, এইচআইভি টেস্টিং এবং কাউন্সেলিং সেন্টার, আইসিডিডিআরবি, মহাখালী, ঢাকা
    ৩. নারীর উপর সহিংসতার শিকার ঃ জাতীয় ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা। জরুরী সেবা ফোন করুন ১০৯২১ নম্বরে।
    ৪. আত্মহত্যা প্রতিরোধ ঃ কান পেতে রই, ঢাকা

- রোহিঙ্গা রেসপন্স ঃ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবী
- এছাড়াও নিকটস্থ অভিজ্ঞ চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী, কাউন্সেলর ও মনোচিকিৎসক (Psychiatrist) এর কাছে সরাসরি রেফার করা যেতে পারে।

কিভাবে রেফার করবেন ঃ

অনেক সময় এমন মনে হতে পারে, **"লক্ষন দেখা যাচ্ছে, তাহলে তাকে ফোন নম্বর দিয়ে দেই বা বলে দেই যে আপনার চিকিৎসা করতে হবে, না হলে আপনি ভালো থাকবেন না এবং এইটুকুই আপাতত আমার দায়িত্ব"**। একটু ভাবুন তো-

- কি লক্ষনের জন্য কার কাছে যাবেন এবং কে উপযুক্ত, তিনি যদি না জেনে থাকেন, তাহলে সেই ব্যক্তি কার কাছে যাবেন বা কেন যাবেন? গেলে কি উপকার পাবেন? আর না গেলেই বা কি ক্ষতি হতে পারে?
- এই সমাজে বসবাসকারী একজন ব্যক্তি যখন জানলো, তার বা পরিবারের কারোও মানসিক সমস্যার লক্ষন আছে, তাহলে ঐ সময়ে তার মানসিক পরিস্থিতি কি হতে পারে?
- ঐ সময়ে যদি আশেপাশে অপরিচিত জনেরা/অন্যরা থাকে, তাহলে সে সামাজিকভাবে তিরস্কার বা বয়কটের কবলে পড়বেন না তো? (যেমন- ঐ বাড়ীতে বিয়ে দেওয়া যাবে না, ওদের সাথে মেলামেশা না করা ইত্যাদি)

রেফার করার সময় পালনীয় কিছু টিপস্ ঃ

১. চেষ্টা করুন, তাকে একা বা ব্যক্তিগতভাবে বলতে। অর্থাৎ কারো সামনে না বলা। এমনকি শিশুর বিষয়ে/সম্পর্কে তার অভিভাবককেও একা বলুন।
২. রেফার করা বিষয়ে কোন অনুগ্রহ করে জোরাজুরি করবেন না।
৩. তাদের মতামতের ভিত্তিতে রাজী করিয়ে রেফার করুন।
৪. আপনি যে তাদের বিষয়ে আন্তরিক, এবং তা সত্যিকারে, তা আচার ব্যবহারে প্রকাশ করুন।
৫. তারা রেফার হলো কি না বা সেবাটি নিতে গিয়েছে কি না, সেবা নিলে তাতে কেমন বোধ করছে, তাদের কোন কথা/অভিজ্ঞতা আছে কি না-এগুলো বিষয়ে তাদের খোঁজ খবর নিতে তাদের সাথে নিয়মিত ফলোআপ করুন
৬. কোন তাড়াহুড়া না করে, শান্ত গলায় আপনার পর্যবেক্ষনগুলো বলুন এবং সেয়ার করার সময় এভাবে বলতে পারেন ঃ

"..... এই লক্ষনটি দেখে আমার মনে হচ্ছে, আপনার বা তার এ লক্ষণগুলো নিয়ে চলতে কষ্ট হচ্ছে। আবার এমন হতে পারে, আগে হয়তো এমন ছিলো না। আপনি কি কখনো ভেবেছেন, মানসিক কারনে এরকম হচ্ছে কি না? যদি হ্যা হয়, তাহলে এ ব্যাপারে একটু লক্ষ্য করা এবং সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে এ বিষয়ে আমাদের দেশে পেশাজীবীরা কাজ করছেন। আপনি চাইলে, আমি তাদের যোগাযোগ নম্বর বা ঠিকানা দিতে পারবো। আমি চেষ্টা করবো আপনাদের পাশে থেকে যতটুকু পারি তথ্য সেবা দিতে। আপনি কি যাবেন এই সেবাটি নিতে?"

"যদি মনে করেন, মানসিক নয় শারীরিক কারনে হচ্ছে বলে মনে হয় তাহলে চেষ্টা করুন সেটা নিশ্চিত হতে, পাশাপাশি মানসিক বিষয়টিও লক্ষ্য করতে পারেন।"

ব্যবহৃত রিসোর্সসমূহ ঃ

১. “কেয়ার ফর কেয়ারগিভার”-ট্রেনিং ম্যানুয়েল, মনোসমীক্ষণী, ভারত
২. “নারীপক্ষ”-এর নিজস্ব রিসোর্স
৩. প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, সেভ দি চিলড্রেন-সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে এবং মানসিক পেশাজীবীদের ট্রেনিং ম্যানুয়েল